উত্তর মেলেনি

শক্তিপদ রাজগুরু

পূর্ত প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা - ৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫১

প্রচ্ছদশিল্পী : লোকেশ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর :
ধর চৌধুরী
প্রেস
টুয়াটোলা লেন
কাতা ৭০০০০৯

হাসে শিবতোষ—কুলিকাবারি মানুষ, লিটারেট মিস্ত্রী তৈরী করছো, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ তো এমনি কাঠ কাঠই হবে মাদার। তা কি গে—স্যার মেজদার বিয়েতে মত দিলেন তাহলে? নাঃ অসাধ্য সাধন করেছো মাদার। পর্বতকে টলিয়েছো তুমি। তাহলে মেজ-বাবুর বরাত ভালো, অবশ্য মেজবৌদিও সত্যি এ গুড লেডি। চার্মিং পার্সোনালেটি।

সুতপা মাছের ঝোল পরিবেশন করছিল। এতকাল সেইই এ বাড়ির বৌ-এর ভূমিকাটার সবটুকু শ্রেষ্ঠাংশ নিয়ে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনুতোষের সঙ্গে অণিমাকে ও এবাড়িতে আসতে দেখেছে। চেনা পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু সুতপা তেমন শিক্ষিতা নয়, গরীবের ঘরের মেয়ে, তাই এখানে এসে এই সংসার নিয়ে, স্বামী নিয়ে, খুশী ছিল। শিবু, করবীর সম্মান ভালোবাসা ও পেয়েছে, নীরবে নয়, সরবে। বিজয়িনীর মত। শ্বাশুড়ী ও শ্বশুর মুখ বুজে বাধ্য হয়েই যেন অণিমার আসার অনুমতি দিয়ে তাকে এ বাড়ির বৌ-এর মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছেন। অণিমা সবই অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে নিজের যোগ্যতা দিয়ে। সুতপার মনের অতলে অণিমার এই প্রাধান্যটাই কোথায় অদৃশ্য কাঁটার মত বেজে। আজ শিবুকেও ভাবী মেজবৌদি সম্বন্ধে ওই কথাগুলো বলতে দেখে সুতপা বলে।

মুখে—তা হবে বৈকি! লেখাপড়া জানা অফিসার মেয়ে।

শিবু বলে—নাঃ। তুমি কিন্তু বাবার দলেই চলে যাচ্ছো বড়, বি লিবারল।

শিবু খাওয়া শেষ করে, উঠে পড়ার আগে সুতপাকেও যেন একটু ইঙ্গিতই করে গেল তার এই মানসিক দুর্বলতা সম্বন্ধে। চুপ করে থাকে সুতপা।

সরমা বলে—ওদিকে পুজোর যোগাড় একটু করে দাও বৌমা, তোমার শ্বশুর এখনও জল খাননি।

সুতপার কাজের যেন শেষ নেই। ভেবেছিল এ বাড়িতে তারই

মত ঘর থেকে অসহায় একটি বৌ এলে সুতপার কিছুটা বিশ্রাম মিলবে কিন্তু সুতপা বুঝেছে তার কাজই বাড়লো, অথচ তা আসনটার মর্যাদাই কমে যাবে কিছুটা এ বাড়ির মানুষগুলো সামনে। সুতপা মুখ ভার করে জবাব দেয়—যাই মা।

কথাটা অণিমাও ভেবেছে।

তার বাবা রতনবাবু মারা গেছেন বেশ ক'বছর আগে তাদের দু ভাই বোনকে রেখে। সংসারে এই মৃত্যুগুলো ঘটে নাটকীয় ভাবে। প্রফেসার রতন বোস ছিলেন শিক্ষাজগতের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি! মারা যাবার সময় অণিমা বি-এ পড়ছে, আর ছোট ছেলে নীলু তখ ক্লাস নাইনে। সংসারটা তবু রতনবাবু আঁকড়ে রেখেছিলেন। নিতা অনেক কালের পুরোনো লোক এ বাড়িতে। সেই নিতাই বলে।

—সব চলে যাবে বাবু। আপনি পড়াশোনা নে থাকে অনুদিদিও কলেজে যাবে, আমি সবদিক সামাল করছি।

অবশ্য সেই থেকে নিতাই আপনজনের মত এই সংসার ঘিরে রেখেছিল। রতনবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু ভুবন বো কাজের মধ্যেও সন্ধ্যায় আসতেন। অণিমা জানে উনি চি চা খান, তাই অণিমাই আনতো ওর জন্যে স্যাকারিণ ট্যাব চা ছানা ফল কিছু।

মিঃ বোস বলতেন—বুঝলে রতন, অণিমা কিন্তু ভে কুলার। তা হ্যাঁ মা, অনার্স পাবেতো? ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে এবার ইকনমিকসে এম-এটা করো। ব্যস—আমার ব্যাঙ্কেই লেগে যাও। তোমাদের মত কৃতি ছাত্রছাত্রী পেলে আমরা ব্যাঙ্ককে অনেক সচল করে তুলতে পারি।

অধ্যাপক রতন বোস বলেন—কি রে অণিমা!

অণিমা কিছু মনস্থির করেনি তখনও। নীলেশও ভালো ছাত্র। ফার্স্ট হয়ে আসছে স্কুলে। হঠাৎ ওই শান্ত ছোট সংসারটায় আসে ঝড় অণিমার বাবা রতন বাবু ষ্ট্রোকে মারা যান। চিকিৎসায়ও

কোন সময় ছিল না। অণিমার চোখের সামনে সর্বনাশের কালো-ছায়া ঘনিয়ে আসে।

তবু সে একাই সংসারের বোঝাটা তুলে নেয়, সহযোগী ওই নিতাই। নিতাই চোখ মুছে বলে—সবই তোমার বিধাতার লীলে দিদি, নাহলে এমনি করে একটার পর একটা ধাক্কা দেয়।

নীলেশ চুপ করে থাকে।

দেখছে নীলেশ দিদির ব্যবস্থাপনায় সংসারের অচল চাকাটা আবার সচল হয়ে ওঠে। সব কাজ দেখে শুনেও দিদি পড়াশোনা করছে। সেই আদর্শটাই যেন নীলেশকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও পড়া-শোনায় মন দেয়।

এই সময়েই নীলেশ দেখেছিল অনুতোষকে প্রথম এ বাড়িতে। ঝলমলে হাসিখুশী একটি তরুণ। অণিমার সঙ্গেই পড়ে ইউনি-ভার্সিটিতে। প্রথম পরিচয়েই ভালো লেগে যায় অনুতোষকে নীলেশের।

নীলেশও দেখে অনুতোষ এবাড়িতে এলে দিদির শান্ত স্তব্ধমুখে হাসির আভা ফোটে।

বলে নীলেশ—মাঝে মাঝে আসবেন অনুদা।

অনুতোষ অবাক হয়—কেন নীলেশবাবু?

অণিমাও চাইল ওর দিকে। নীলেশ বলে—আপনি এলে দিদির মুখে তবু হাসি দেখি। নাহলে দিনভোর পড়া আর পড়া নিয়েই থাকে। এককালে ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো দিদি, সে সবও ছেড়ে দিয়ে কি দিনরাত ভাবে। আপনি এলে তবু হাসে—গান গায়।

অণিমা যেন লজ্জায় পড়ে। ওর ফর্সা মুখে সলজ্জ আরক্তিম আভাষ ফুটে ওঠে। অণিমা ধমকে ওঠে।

—থামবি তুই, দিনদিন খুব বেড়েছিস দেখছি। ইয়ার্কি হচ্ছে?

নীলেশ অবাক হয়—বাঃ রে!

তবু অণিমার নিঃশব্দ জীবনে অনুতোষের এই আবির্ভাবকে অণিমা একটু বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পারেনি। এমনিতে সংযত

সে। ক্লাশে দেখেছে অনেক ছেলে মেয়ের উছল ব্যবহার। তুমি থেকে 'তুই' ডাকতে তাদের বাধে না। ক্যানটিনে করিডোরে জমিয়ে হৈ চৈ করে আড্ডা মারে। কিন্তু অণিমা বার বার ঘা খেয়ে যেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। পড়াশোনা করে মন দিয়ে, ক্লাশ করে নোট নেয়। ছেলেরা বলে ডক্টরেট করবে কিনা, মেয়েরা পড়াশোনা করলে ডাঁট বাড়ে।

ওই আড্ডাকে এড়িয়ে চলে অণিমা, যেন সে নিঃসঙ্গই। এমনি দিনে দেখেছিল অনুতোষকে। শান্ত ছেলেটি লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করে।

সেদিন আবার বৃষ্টি নেমেছে, আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি। কলকাতার পথঘাট জলের তলায়। অনুতোষ বের হয়ে এসেছে পথে। বৃষ্টি থামলেও আকাশ তখনও থমথমে। সন্ধ্যা নামছে। গাড়ি-বাস-ট্রাম কিছুই নেই পথে। কলেজস্ট্রীট-কলেজ স্কোয়ার জলে থৈ থৈ করছে। রাস্তা নয় ভিনিসের খাল।

—কোনদিকে যাবেন ?

অনুতোষই ওদিকে চুপ করে অণিমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধলো। অণিমা ভাবছে ফেরার কথা। অনুতোষকে দেখে চাইল। ক্লাশে চুপচাপ থাকতে দেখে ওকে। শান্ত ছেলেটি ওর বিপদের কথা ভেবেই এগিয়ে এসেছে। অণিমা বলে—দেশবন্ধু পার্ক, দীনেন্দ্র স্ট্রীটে যাবো। এদিকে তো এই অবস্থা !

অনুতোষও যাবে শ্যামবাজারের ওদিকে। বলে সে—হাঁটতেই হবে। বরং বই খাতাগুলো আমাকে দিয়ে কোনরকমে হাঁটতে সুরু করা ভালো। ঠনঠনিয়ায় অনেক জল, সিধে রাজাবাজার হয়ে, চলুন।

দীর্ঘপথ হাঁটতে তবু যেন ক্লান্তি বোধ করে না আজ অণিমা। দুজনে এগিয়ে চলেছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে অণিমাও বলেছে তাদের বাড়ির কথা। অনুতোষ-এর খবরটা ও কিছু জেনেছে।

নীলেশ অপেক্ষা করছে, দিদি তখনও ফেরেনি। ঘরে তাদের

দুজনকে আধভেজা অবস্থায় ঢুকতে দেখে চাইল। অনুতোষ বলে —আমি চলি।

হাসে অণিমা—সে কি! একটু কফি খেয়ে যান, যা ভিজেছেন! নীলেশ বলে—আপনি না থাকলে দিদিটা যা ভীতু, ও আসতেই পারতো না।

অণিমা ধমকে ওঠে—থাম তুই! বসুন, কফি করে আনি।

নীলেশও অবাক হয়। অনেক দিন পর স্তব্ধ বাড়িটায় দিদির গানের সুর শুনেছে সে। অণিমা গুনগুণিয়ে গাইছে একটা গানের কলি। হঠাৎ নীলেশকে দেখে চাইল, শুধোয় সে—কি রে?

নীলেশও বলার কিছুই পায় নি। তবু দিদির মনের অকারণ খুশিটুকু তার চোখ এড়ায়নি। নীলেশ বলে— এমনি।

অনুতোষও এ বাড়িতে এসে যেন মুক্তির স্বাদ পায়। তাদের বাড়ির পুরোনো বাঁধাধরা ছক থেকে এর পরিবেশ স্বতন্ত্র, অনেক সহজ, ঢিলে ঢালা। অণিমাও যেন সহজ হয়ে উঠেছে। পড়ার পরিবেশও আছে এখানে।

অনুতোষদের সাবেকী সেকেলে বাড়িটা অনুতোষের কাছে অনেক রসকষহীন বলে মনে হয়। নীলেশ বলে।

—এইখানেই পড়াশোনা নিয়েই ডুবে আছে। তবে অনুদা, দিদিকে ফার্স্টক্লাস দিতেই হবে, যা পড়ে। দেখুন না—আমাকেও ষ্ট্যাণ্ড করিয়ে ছেড়েছে।

অনুতোষ বলে—তোমার দিদির দৌলতে এবার ষ্ট্যাণ্ড করতে পারি কিনা দেখি।

অণিমা আড়ালে বলে—তুমি খুব ফাজিল কিন্তু!

অনুতোষ আর অণিমা এখন অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। ক্লাশের পর দুজনে বের হয়ে পড়ে ইডেনের দিকে গঙ্গার ধারে। অবাধ মুক্তির মাঝে তারা যেন দুজনকে নতুন করে চিনতে চায়।

গঙ্গার বুকে সূর্যাস্তের রং জেগেছে, পাখীদের কলরব ওঠে। অনু বলে—ফাজিল! আমি! তাহলে তোমার সিলেকশনে ভুল হয়েছে।

অণিমা অবাক হবার ভান করে—সিলেকশন করলাম কখন মশাই ?

অনুতোষ বলে—নাহলে সহজে এগিয়ে এসেছো ? এই চল না—একটু নৌকায় করে ঘুরে আসি !

হাসে অণিমা। লোভও জাগে তার মনে এই ঘনিষ্ট হবার। মনে সুর ওঠে। চুপ করে কি ভাবছে সে। অনুতোষ দেখছে ওকে। বলে সে—এ্যাই ভয় পেলে নাকি !

অণিমার মনে একটু দোলা লাগে, তবু এড়িয়ে যায় সে '

—চলো তো। সামনে পরীক্ষা, এখনও আড্ডা দিচ্ছো ! ওঠো।

হতাশ স্বরে অনুতোষ বলে—উঃ এ পাঠ-এর জ্বালা কবে শেষ হবে বলতে পারো ?

মিঃ বোস এই ছোট পরিবারটির উপর নজর রেখেছেন। তার বাল্যবন্ধু রতনবাবুর অবর্তমানেও আসেন মাঝে মাঝে। অণিমার এম-এ পাশ করার খবরের দিন তিনিও এসেছিলেন খুশী হয়ে। অনুতোষকে দেখেন এখানেই। অণিমাই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—এবার একসঙ্গে পাশ করলাম কাকাবাবু, অনুতোষ বাবু গ্রাহামস্-এ ঢুকছেন, বিজনেস ম্যানেজমেন্টে।

খুশি হন মিঃ বোস—রাঃ ভেরিগুড। তা অণিমা তুমিও এবার এসো আমাদের ব্যাঙ্কে। জুনিয়ার অফিসার হয়ে থাকবে, ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়ার সুবিধা অনেক। চলে এসো !

অনুতোষই সায় দেয়—তাই যাও অণিমা। এ্যাপ্লয়েড ইকনমিস্ এর প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড ট্রেনিং ব্যাঙ্কেই পাবে।

ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে উচ্চধারণা যাদের, তাদের মিঃ বোস পছন্দ করেন। অনুতোষের ওই মন্তব্যে খুশি হয়ে ওঠেন তিনি।

—কারেক্ট, ঠিক বলেছো মাই বয়। অণিমা আজ চলি, তুমি যে কোন দিন এসে দেখা করো অপিসে।

মিঃ বোস চলে যেতে অনুতোষ অণিমার হাতটা ধরে ফেলে। চমকে ওঠে অণিমা—এ্যাই !

হাসে অনুতোষ—বাঃ রে ! কনগ্রাচুলেশনস্ জানাতেও দোষ ! যাচা চাকরী ! আমাকে তো ঝাড়া একঘণ্টা ধরে গ্রাহাম কোম্পানীর ডিরেকটার বোর্ডের সামনে বলির পাঠার মত বসে থাকতে হয়েছিল, আর কি প্রশ্ন সব ! পৃথিবী কেন গোল নয়—উত্তর দক্ষিণ ঈষৎ চাপা তার কারণ বলো—হেনা তেনা এইসব গোছের কথা। নাঃ মিঃ বোস সত্যিই ভদ্রলোক।

অণিমা বলে—তা সত্যিই, তবে কি জেনে গেলেন জানো ?

—কি !

অণিমা মুখ নামায় সলজ্জভাবে। বলে সে—তুমি একটা ইয়ে কিছুই বোঝনি ?

—মানে !

হঠাৎ অণিমার ডাগর চোখে ওই ভাষাটা পড়ে যেন কি আবিষ্কারের খুশিতে ফেটে পড়ে অনুতোষ উদ্দাম হাসিতে।

অণিমা ধমকে ওঠে—এ্যাই ! কি হচ্ছে ?

...চাকরীটা অণিমাকে নিতে হয়।

মিঃ বোস বলেন—মন দিয়ে কাজ করো, এখানে চোখ কান খুলে কাজ করবে। কোন অসুবিধা হলে পাশের চেম্বারে অভিজিৎ বসে—ওর সঙ্গে কনসাল্ট করবে। না হয় সোজা আমার কাছে আসবে। অভিজিৎ—আমাদের এখানে নোতুন আসছেন উনি অণিমা বোস—ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রী। একটু হেল্প করো ওকে।

অণিমা এই প্রথম মিঃ বোসের চেম্বারে এসেছে। এতদিন ধরে মানুষটির বাইরের অন্য সত্তার সঙ্গে পরিচিত ছিল সে। তার বাবার সঙ্গে আড্ডায় বসতেন। আজ এই বিরাট ওয়াল টু-ওয়াল কার্পেট পাতা এয়ার কুলার লাগানো ঠাণ্ডা ঘরে ঝকমকে টেবিলের সামনে অন্য একটি দায়িত্ববান মানুষকে দেখেছে অণিমা।

ওপাশে বসেছিল একটি তরুণ। অভিজিৎ রায়—ব্যাঙ্কের অফিসার। তরুণ ভদ্রলোক বলে—সব ঠিক হয়ে যাবে স্যার।

মিঃ বোস বলেন—অণিমা, অভিজিৎ-এর সঙ্গে যাও। ওই-ই সব শিখিয়ে দেবে। উইস্ ইউ বেস্ট অব দি লাক্।

এতদিন অণিমা কাটিয়েছে মুক্ত বাধাহীন পাখীর মত। ক্লাশ—মাঝে মাঝে ময়দান—গড়ের মাঠ, না হয় ডায়মণ্ডহারবারের নদীর তীরে দুজনে ঘুরেছে। আজ দশটা থেকে পাঁচটা অবধি এক বিচিত্র পরিবেশে বিরাট বিরাট সেফে আলমারি কিছু চিঠি পত্রের ফাইল এর মধ্যে এক নোতুন জগৎকে আবিষ্কার করেছে অণিমা।

বুড়ো বেয়ারা মহেশ চা এনে দিয়েছে। বলে সে—দিদিমণি, খাবার কি আনতে হবে বলবেন? প্লেট-গ্লাশ ষ্টোর থেকে এনেছি। আপনার তোয়ালে—মহেশই যেন এদিকের ম্যানেজার।

মহেশই মনে করিয়ে দেয়—পাঁচটা বাজছে দিদিমণি।

অর্থাৎ মুক্তির খবরটা ও-ই দেয় ওকে।

···বৈকালে ব্যাঙ্ক এর বড় বাড়িটা থেকে রাস্তায় বের হয়েছে অণিমা। বৈকালের ডালহৌসী এলাকায় তখন জনস্রোত বয়ে চলেছে। অণিমাও তার অজানতেই যেন প্রবাহমান ওই স্রোতের সামিল হয়ে গেছে।

—এ্যাই।

হঠাৎ চাইল অণিমা। এগিয়ে আসছে অনুতোষ। অণিমার ক্লান্ত মুখে ফুটে উঠে কি একটু আভা। এই জনারণ্যে যেন এমনি সঙ্গই খুঁজছিল সে। অনুতোষ বলে—কেমন চাকরী করলে?

ঝাউগাছের চিরল পাতায় শেষ সূর্যের রক্ত রং-এর আভা জাগে। ঝিলের জলে পড়েছে আঁধার-নামা ছায়া, গাছগুলোর ঘনসবুজ পাতায় ডালে পাখীদের স্বর যেন নীড়ে ফেরার কথা মনে করায়!

অণিমা বলে—দারুন! উঃ কি হ্যাক্‌নিড জীবন। এমন চাকরী কি করে করো বলতো?

অনুতোষ বলে—মাসের শেষের দিনের পে প্যাকেটের জন্ত

এসব সইতে হয় ম্যাডাম : তবে এর চেয়ে সাবেকী প্রথায় চাল কলা বেধে ঘণ্টা নেড়ে পুজো টুজো করার মধ্যে স্বাধীনতা ছিল।

অণিমা শোনায়—ছিলই তো ? অর্থনৈতিক চাপে সব হারিয়েছি আজ।

অনুতোষ দেখছে অণিমাকে। জানায় সে।

—এ যে আমাদের স্যারের মতো কথা বলছে! আমার বাবা, ছোটভাই ও'কে স্যার বলেই ডাকে।

অণিমা বলে—ঠিকই বলেন তিনি। চলনা—একদিন নিয়ে যাবে তাঁর কাছে। তোমাদের বাড়ীও দেখা হবে।

অনুতোষ একটু ঘাবড়ে যায়। মা-বৌদি সবাই ঠিক আছে, কিন্তু ভয় হয় তার বাবাকে নিয়ে। তবু বলে সে।

—যাবে বৈকি। ঠিক আছে একদিন রবিবার চল!

কি ভেবে অনুতোষ বলে—তাছাড়া যাওয়া দরকার! হয়তো সবটা ভালো না লাগতে পারে, তবু সব জেনে শুনে এগোনো ভাল অণিমা।

অণিমা চুপ করে থাকে।

অনুতোষের কথার মধ্যে একটি অনুক্ত সুর তার মনে সাড়া তোলে। কথাটা অনিমাও ভেবেছে। এভাবে জীবনটাকে টেনে নেওয়া যাবে না চিরদিন। তার চিরন্তন নারীমনে একটি প্রশ্ন জেগেছে বারবার!

অনুতোষদের বাড়ি এসেছিল অণিমা একটা ছুটির দিন। সরমা-সুতপা-করবীদের দেখেছে। সাধারণ মধ্যবিত্তদের মা বৌ-বোনের মতই আটপৌরে, সাদামাটা ধরনের।

শিবুই যেন ব্যতিক্রম।

শিবু বলে—আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই তবে শুনেছি ভালো চাকরী করেন।

অবাক হয় অণিমা খেয়ালী তরুণটিকে দেখে।

বলে অণিমা—তুমি তো কথা বল দেখছি নীলু, আমার ছোট ভাই এর মত!

হাসে শিবু—তাহলে গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক। তিনিও নিশ্চয় গ্রেট ম্যান।

অণিমা জানায়—তা নিজেকে সেইরকমই ভাবে টাবে।

শিবু বলে—লড়াই-এর চপ আনছি, খেয়ে যেতে হবে।

উত্তর কলকাতার এদিকে ওটার নাম ডাক তখন জোর। লড়াই করার সঙ্গে এ চপের কি সম্বন্ধ আছে জানা যায়নি, তবু ওই নামেই পরিচিত উনি।

অণিমা বলে—ওসব আর একদিন এসে খাবো। আমাদের বাড়িতে এসো, নীলুর সঙ্গে পরিচয় হবে।

শিবু বলে—যাবো একদিন, তবে কবিরাজী খাওয়াতে হবে। ওটা রিয়েলি ভালো।

অণিমা হাসছে ওর কথায়। বের হবার মুখে সরসীবাবুকে প্রণাম করতে যায়।

বয়স হয়েছে, ঘরের ওপাশে নানা বই!

সরসীবাবু একবার চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে দেখে বলেন।

—থাক! থাক!

সন্ধানীদৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন অণিমাকে। তেমন কিছুই বলেন না। এ বাড়ির নীরবতার জগতে উনি যেন অতীতের সাক্ষী হয়েই রয়ে গেছেন।

অণিমা কথাটা ভেবেছে বারবার।

ওই সাবেকী আমলের বাড়ির মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে, একটা স্তব্ধ গুমোট পরিবেশ, তবু সব ছাপিয়ে শিবুকে মনে পড়ে।

অনুতোষ শুধোয়—কি হ'ল, চুপকরে আছো যে?

হাসে অণিমা—এমনিই!

—হিসেব করছো, ঠকবে না জিতবে? অনুতোষের কথায় চমকে ওঠে অণিমা। তার মনের অতলের খবরটা যেন জেনেছে

ওই অনুতোষ। তবু সব ছাপিয়ে অণিমার মনে অনুতোষের এই অস্তিত্বটা জেগে ওঠে আলোক বিন্দুর মত।

তাকে অস্বীকার করতে পারে না অণিমা।

দোলের দিন দুপুরের পরই এসে হাজির হয় অনুতোষ। অণিমা দোতলা থেকে দেখেছে রাস্তায় দোলের সেই উৎপাত, অনুতোষ-এর কথায় অবাক হয় সে—এই কাণ্ড চলেছে, বের হবো কি করে?

হাসে অনুতোষ—বিকালে থাকবে না। চলো একটু বেরুবো! আর রং কেউ দেয়, দেবে!

অণিমা চমকে ওঠে—ইস্! না-না! আবীর মাখাবার নাম করে ছেলেরা মেয়েদের যা করে? বিচ্ছিরি।

হাসছে অনুতোষ—ছেলেরা হ্যাংলা তাই বলতে চাও, না?

দুহাতে ওকে কাছে টেনে নেয় অনুতোষ। অণিমার সারা দেহ মনে ঝড় ওঠে। অণিমা তবু বলে—এ্যাই! ওঘরে নীলু রয়েছে, প্লিজ।

হাসছে অনুতোষ ওকে সরে যেতে দেখে!

ইডেনের ওদিকে গঙ্গার ধারে ভীড় আজ কম। চাঁদের আলোয় বান ডেকেছে জোয়ার ভরা নদীতে। গাছ গাছালি—সবুজ মাঠ—ঝাউগাছগুলো সেই আলোয় উল্‌সে ওঠে। অনুতোষ আর অণিমা দুজনে চলেছে নৌকায়। অণিমাও যেন সারা মন দিয়ে আজ এমনি এক অজানা জগতের গহণে হারিয়ে যেতে চায়।

ছই-এর ভিতর হাওয়ার দাপাদাপি, টলছে নৌকাটা। দুজনের নিবিড় স্পর্শে আজ ওরা দুজনকে কাছে পেয়েছে। অনুতোষ পকেট থেকে আবীর বের করে এবার আচমকা অণিমাকে কাছে টেনে নিয়ে ওর মুখ মাথা আবীরে ভরিয়ে দেয়!

চমকে ওঠে অণিমা।

—এ্যাই; ভাকাত কোথাকার। এ কি করলে?

চাঁদের আলোয় দেখা যায় বিচিত্র কোন রহস্যময়ী নারীকে।

অণিমার মুখ মাথা ভরে গেছে, অণিমা দুহাতে শাড়ির আঁচল দিয়ে আবীর সাফ করতে থাকে।

সিঁথির গভীরে লাল আবীর গাঢ় হয়ে বসেছে। অণিমা বিরক্তি ভরে বলে—কি করলে বলো দিকি ?

অনুতোষ বলে—ওটুকু এবার পাকাপাকি ভাবেই রাঙ্গিয়ে দিতে চাই অণিমা।

অণিমাকে কাছে টেনে নেয়। আজ বাধা দিতে পারেনা সে, তার মনের অতলে কোথায় ঘরবাধার এই কামনা আজ সোচ্চার হয়ে উঠতে চায়।

বাড়ি ফিরে অণিমা নিজের ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে থমকে দাঁড়ালো, নীলেশ নেই। কোথায় গেছে। একা ঘরে উছল আলোয় ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নায় হঠাৎ নিজেকে দেখে চমকে ওঠে।

সিঁথিতে গাঢ় লাল আবীর, শাড়িটা কি খেয়াল বশে মাথায় তুলে দেখছে নিজেকে।

নিজেদের জীবনধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরোনো কোন ভালো চাকরীরতা মেয়ে হিসেবে নয়, নিজেকে এমনি শান্ত কোন গৃহবধূ রূপে দেখেই যেন বার বার আশ মেটেনা তার। অনেক কিছুই পেতে চায় তার নারীমন।

জীবন সত্যিই বিচিত্র।

নানা ঘাটে তার নানা রূপ। আর এইখানে বাঁচার জন্য সেই রূপবদলেরও প্রয়োজন হয়। মনের চাওয়া থাকে অনেক—তবু তাদের ডাকে সাড়া দেবার সময়ও পিছু টান আসে। পাবার দাবী বোধহয় সীমিত।

মিঃ বোস মানুষ হিসেবে বিচিত্র। অফিসে তিনি পাকা ব্যবসায়ী। নিজেই সব কাজ কর্মের খবর নেন।

কাজে ভুল হলেও চেয়ে থাকেন স্তব্ধ চাহনি মেলে। বলেন না কিছু, কিন্তু সেই নীরবতা যেন কিছু তিরস্কারের চেয়েও কঠিন।

সারা অফিসে তাঁর নীরব অস্তিত্বটা মুছে যায় না।

আবার বাইরে ইনি স্বতন্ত্র মানুষ। অণিমাকে ঢুকতে দেখে চাইলেন তিনি।

—কিছু বলবে ?

অণিমা ওর পি-এর দিকে চাইতে কি বুঝে নিয়ে মিঃ বোস বলেন—সেবা একটু তোমার ঘরে যাও পরে ডিকটেশানটা দেব।

—ইয়েস স্যার।

পি-এ ওদিকে চলে যেতে মিঃ বোস চাইলেন অণিমার দিকে।

—এনি প্রবলেম ?

অণিমার কথা যেন বন্ধ হয়ে আসে। ছেলেবেলা থেকে দেখেছে এই দরদী মানুষটিকে। আজ কথাটা তাঁকে জানানো দরকার।

অণিমার জীবনের এই প্রশ্নটার সমাধান তাকে পেতে হবে।

—বলো ?

অণিমা কোনরকমে কথাটা জানায়, অনুতোষের বর্তমান চাকরী তাদের পরিবারের কথা, সবকিছুই। অণিমা বলে।

—আজ বাবা নেই, আপনিই আপনজনের মত। তাই কথাটা বলা দরকার বলে জানালাম। জানিনা—আমি কি করবো।

মিঃ বোস দেখছেন অণিমাকে। অনুতোষের কথা মনে পড়ে। ঐ কোম্পানীর সঙ্গে তাদের কাজ কারবার অনেক দিনের। মিঃ অনুতোষ-এর পজিসন সেখানে কি তাও জেনেছেন মিঃ বোস। কি ভাবছেন তিনি। এয়ার কুলার মেসিনের মৃদু গুঞ্জন ওঠে। স্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে গেছে অণিমা। মিঃ বোস বলেন।

—যদি দুজনের কোন আপত্তি না থাকে বিয়ে করবে। অনুতোষ ইজ এ গুড বয়।

অণিমা ওঁর দিকে চাইল।

মিঃ বোস পাক্কা সাহেব সেজে থাকেন। ইংরেজের ডিসিপ্লিন কর্মনিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করেন। মেনেও চলেন। কিন্তু তবু মনে মনে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চান, তাঁর পরিবারেও রাখছেন।

বৈষ্ণব ধর্মের সেই তত্ত্ব নীতিটিকে তিনি নিজের জীবনেও মেনে চলেছেন। সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। বিনয়টুকুকে হারান নি।

বলেন মিঃ বোস—সংসার বড় বিচিত্র অণিমা। এ সংসারে সবাই সবকিছু পেতে চায়, স্বামী-ছেলে-মেয়ে বন্ধুবান্ধব আপনজন সকলেই চাইবে তোমার কাছে কিছু পেতে। আর তোমাকেও দিতে হবে। কিন্তু বিনিময়ে যেদিন তাদের কাছে তুমি কিছু পেতে চাইবে সেদিনই ভুল করবে। কিছু চাইলে পাবে শুধু মাত্র দুঃখ, বঞ্চনা।

তাই মনে হয় করেই যেতে হবে সকলের জন্য, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কিছু পেতে চাইবে না কোনদিন।

গীতায় তাই বলেছে—কাজই করে যাও, ফলভোগ করতে চেওনা। আর চণ্ডীদাসের ওই পদাবলীর কটা ছত্র বারবার মনে হয়।

চণ্ডীদাস কহে
শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই॥

সংসার স্বামী-ছেলেমেয়ে সকলকে নিঃস্বার্থভাবেই ভালোবাসবে।

হঠাৎ খেয়াল হয় অনেক কথাই বলে ফেলেছেন তিনি। অণিমা অবাক হয়ে দেখছে ওই বিচিত্র কঠিন কোমল মানুষটিকে। তাঁর নিজের জীবনের কি অনুক্ত বেদনায় ওঁর জীবন ভরে আছে, তবু সকলকে ভালোবাসা দিয়ে যেন সেই বেদনাকে ভুলতে চান।

মিঃ বোস বেলটা বাজালেন। পি-এ ঘরে ঢোকে।

মিঃ বোস বলেন—ঠিক আছে অণিমা। ইউস ইউ গুডলাক্। তবে নেমন্তন্নটা যেন বাদ না যায়! যাও—ফাইলগুলো ক্লিয়ার করো গে, এখন।

অণিমা উঠে গেল।

মনে হয় একটা মস্ত বাধা সে পার হতে পেরেছে। খুশিমনে ঘরে ঢুকে ফাইলগুলো টেনে নেয়।

অফিসে অণিমা যদিও অফিসার তবু মেয়েদের মধ্যে সহজভাবে মেশে সে। মেয়েরাও অনেকে তাকে ভালবাসে। এ অফিসে একমাত্র মহিলা অফিসার সে। মেয়েদের কিছু সুখ সুবিধা, তাদের রিটায়ারিং রুমও সেই-ই করিয়েছে।

সবিতা নিবেদিতা বাণী সেবা লতিকা ওরা এসে পড়েছে রিটায়ারিং রুমে। অফিসের গুমোট পরিবেশের মাঝে তাদের মন খুলে কথা বলার, হাসি-ঠাট্টা করার জায়গাটা এটা। এটা যেন নিভৃত একটি দ্বীপ। হাসি—কলরব ওঠে।

রেবা বলে—কি রে নিবেদিতা, তোদের বিয়ের কি হল? কতদিন আর ঘোরাবি ডেসপ্যাচের নবনী সেনকে!

নিবেদিতা গালে পাফ্ বুলোতে বুলোতে বলে।

—ঘুরুক না বাবা। আমি কিছু বলেছি? বুঝলি ছেলেগুলোর ওই হ্যংলামো ভালো লাগেনা।

সবিতা গম্ভীর ভাবেই থাকে অফিসে। এদের তুলনায় তার বয়স একটু বেশী। তবু এখনও বিয়ে থা হয়নি। আড়ালে মেয়েরা বলে—বিয়ে হবে কি করে তখনতো ভেবেছিল কোন ডাক্তার-ইন্‌জিনিয়ার নিদেন প্রফেসর এসে ওকে গলায় মালা দে সেধে নিয়ে যাবে। ওইতো রূপ। সাধারণ ছেলেগুলোর দিকে তখন নজরই দেয় নি। নাক উঁচু করে এড়িয়ে গেছে। এখন তাদের পিছনেই ফ্যা ফ্যা করছে।

সবিতার মনের অতলে তাই যেন একটা অতৃপ্তি, জ্বালা রয়ে গেছে। হারানো যৌবনের ব্যর্থতায় সে গুমরে ওঠে। সবিতা ওদের কথায় হাতের উল বোনা বন্ধ রেখে বলে—ছেলেদেরই শুধু দোষ? আজকালকার মেয়েদের দোষও কম নয়।

চুপ করে যায় রেবা।

নিবেদিতা চেয়ে থাকে।

সুষমা বিবাহিতা মহিলা। ও জানে এদের যন্ত্রণা-ব্যর্থতার কথা। তবু এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে ওঠে।

—কি বুনছ সবিতা ?

সবিতা বলে—কাজ না করে থাকতে পারিনা সুষমা দি। একট সোয়েটার বুনছি।

ওর সোয়েটার-মাফলার বোনার পিছনে যেন কি একটা ইতিহাস আছে। অনেক সময়ই এক একটা সোয়েটার সুরু করে, কিন্তু বেশ কিছুদিন কাজ এগোবার পর হঠাৎ দেখা যায় সবিতার হাসি খুশী ভাবটা মুছে যায়, আর সেই সোয়েটার, মাফলারটাকেও দেখা যায় না।

হঠাৎ কিছুদিন পর আবার নোতুন রং নোতুন ডিজাইনের সোয়েটারের কাজ সুরু হয়। মেয়েরা জানে সেই কারণটা। নিবেদিতা বলে।

—ওটা শেষ হবে তো সবিতা দি ?

সবিতাকে কেউ দিদি বললে সে চটে যায় মনে মনে। নিজেকে এখনও একটু বেশী সাজিয়ে রাখে, শাড়িও পরে তেমনি জমকালো গোছের। সবিতা বলে।

—তুমি কিন্তু আমারও সিনিয়র নিবেদিতা।

—সেতো অফিসের খাতায়।

হঠাৎ ওদের আলোচনায় এসে তুফান তোলে সেবা ঘোষ। খাস বড় সাহেবের পি-এ। অনেক খবর থাকে তার কাছে। কোন সেকশন ইনচার্জ আজ ঠুসুনি খেয়েছে বড় সাহেবের ঘরে, কোন অফিসারকে কি বলেছেন এমনি নানা খবর। সেবা আজ বলে।

—দারুণ খবর আছে মেয়েরা।

শীলা শুধোয়—কি খবর! ডি-এর স্ল্যাব বাড়ছে ?

হেসে ওঠে সেবা—ধ্যুস মুখপুড়ি, বিয়ে থা করে একেবারে

ওই ডি-এ, ওভারটাইম-এর হিসেব নিয়েই থাকলি। তোদের অফিসার ওই অনুদির যে বিয়ে।

—তাই নাকি! নিবেদিতা খুশী হয়। বলে সে—তা পাত্র কে র? এ্যাকাউন্টস অফিসার ওই অভিজিৎ বাবু নাকি? দুজনে তো খুব ভাবসাব।

হাসে সেবা—আজ্ঞে না। আগে থেকেই বুকড ছিলেন অন্যত্র!

সবিতা কথাগুলো শুনছে। তার কাছে এ খবর যেন কি বুকচাপা ব্যর্থতাই আনে! সকলের জীবনেই কেউ না কেউ আসে, কি ভাবছে সবিতা। বলে সে—সেকশনে যাই!

এমন সময় অণিমাকে ঢুকতে দেখে ওরা সকলে হৈ হৈ করে ওঠে।

—কনগ্রাচুলেশনস্ অণিমা দি।

অণিমাও অবাক হয়—ব্যাপার কি?

হঠাৎ সেবাকে দেখে মনে হয় খবরটা ছড়িয়েছে কোন সূত্র থেকে।

রেবা বলে—খাওয়াতে হবে কিন্তু।

কে শোনায়—নেমন্তন্নটা যেন ফস্‌কে না যায়!

সবিতা উঠে পড়ে। ওদের হাসি কলরব একজনের পূর্ণতার খবরে যেন তার মনের শূন্যতাটাই বড় হয়ে উঠেছে, ওরা সবিতার এই চলে আসাটাকে লক্ষ্য করে না। অণিমাকে নিয়েই ব্যস্ত ওরা।

অণিমা চেম্বারে ফিরে কাজে বসেছে। ক'টা ফাইলে নোট দিতে হবে। লোন রিয়ালিজেশন ঠিক মত হচ্ছে না, সেগুলো নিয়ে বসেছে। এমন সময় অভিজিৎকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—বসুন।

অভিজিৎ ওকে দেখছে, শান্ত স্তব্ধ একটি তরুণ। অভিজিৎ বলে—খবরটা শুনে অভিনন্দন জানাতে এলাম। বেষ্ট অব্ দি লাক্!

অণিমা দেখছে ওকে। হঠাৎ চকিতের জন্য অণিমা যেন অভিজিৎ-এর ওই কথাগুলোর মাঝে কি একটা স্তব্ধ বেদনার সুর

শুনে একটু অবাক হয়। অভিনন্দন নয়—ও যেন আরও বলতে চেয়েছিল।

কিন্তু সে কথা বলা হয় নি। অভিজিৎ বলে।

—আমি চলি।

বের হয়ে গেল সে। অণিমা চুপ করে দেখছে ওই তরুণটিকে হঠাৎ যেন ক্ষণিকের জন্য কি বেদনার একটি সুর তার মন ছুঁয়েছে।

মনে পড়ে অনুতোষকে!

ঝড়ের মত ও এসে পড়ে এ বাড়িতে যখন তখন।

বিয়ের সমস্ত আয়োজনও হয়ে গেছে। অনুতোষ বলে।

—বাবা শাস্ত্র-টাস্ত্র নিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, বিয়ে যখন হবে তখন অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি থাকলে চলবে না।

নীলেশ বলে—গুড! মানে ছাদনাতলা, পুরোহিত টুরোহিত সব। ও যে নানা হাঙ্গামা!

নিতাই প্রবীণ লোক। সে বলে ওঠে।

—ওসব তোকে ভাবতে হবে না নীলু! বিধু পণ্ডিতকে বলেছি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

অণিমার ভয় হয়! এতদিন পর হঠাৎ যেন কি বাঁধনে জড়াতে চলেছে সে, চলেছে অন্য সংসারে। অণিমা বলে অনুতোষকে।

—আমার ভয় করছে।

অনুতোষ বলে—ভয় কি? চেনা লোকের সঙ্গেই তো যাচ্ছো।

—কিন্তু পরিবেশ তো আলাদা।

—সব মানিয়ে নেবে, তা জানি অণিমা।

মেয়েরা হয়তো পারে। তাদের প্রকৃতিতে এমন একটা সত্ত্বা আছে যাতে তারা এটা পারে। এই নোতুন জন্মের কথা তারা ভেবে নিয়েই নিজেদের তৈরী করে। তাই এক মাটি থেকে উঠে এসে অন্য মাটিতেও তারা সহজ ভাবেই নিজেদের বিকশিত করে তোলে। নোতুন সংসার গড়ে।

তবু বলে অণিমা—নীলেশের জন্য ভাবনা হয়।

নীলেশ এবার বি-এ দিচ্ছে। ইংরাজী অনার্সের কৃতি ছাত্র। বাইরের জগতকে চিনেছে কিছুটা। তাই বলে সে।

—তুই তোর ঘর সামলাগে দিদি। আমার জন্য নো ফিয়ার! নিতাইদা আছে সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। আর তারপর অসুবিধা হয়—

অনুতোষ বলে—ওরও একটা বিয়ে থা দিয়ে দেব তখন!

নীলেশ চমকে ওঠে—ওরে বাব্বা। নিজে করছেন বুঝবেন ঠ্যালা। দিদিটিকে সামলাবেন তখন। ওসবে আমার দরকার নেই।

হাসে অণিমা—ফাজিল কোথাকার।

—ফাজলামি করছি না দিদি। আমি সিরিয়াস। সংসার টংসার নামক বস্তু অতীব কঠিন ঠাঁই। ওতে আমি নেই।

নীলেশের কথায় হাসছে অনুতোষ।

—ঠিক আছে। রোজ অপিস ফেরতা হানা দিয়ে যাবো এবাড়িতে।

অনুতোষও খুশী হয়।

প্রথমে সেও শুনেছিল তার বাবার এ বিয়েতে অমতের কথা। হয়তো সেটাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে। মা দাদাও ঠিক এটা চায় নি। কিন্তু অনুতোষ এর মনে হয় অণিমাকে সে কথা দিয়েছে। তাই বলে।

—তোমাদের আপত্তির কারণটা কি?

মা বলে—কত্তা পছন্দ করেন না।

—কিন্তু ওকে কথা দিয়েছি আমি। অনুতোষ বলে।

মা চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। সরমা বুঝেছে সংসারের জন্যই ছেলের এই দাবীকে মেনে নিতে হবে। তাই হয়তো জোর করেই ওরা মেনেছিল অণিমাকে।

অবশ্য করবীও খুশি হয়, নোতুন বউদিকে দেখে। আর এবাড়িতে খুশী হয়েছে শিবতোষ। ওদের উৎসাহই বেশী। বড়ভাই প্রাণতোষও চুপ করে থাকতে পারেনি।

আত্মীয় সমাজ আছে, বন্ধু বান্ধব পরিজনও রয়েছে। তাই চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্যই বিয়েতে সব অনুষ্ঠানও করতে হয়েছে।

পুরোনো আমলের বাড়িটাকে রং কলি করিয়ে আলোকসজ্জাও করা হয়েছে। ছাতে ম্যারাপ বেঁধে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। শিবুই সানাই আনিয়েছে। অনুষ্ঠান সবই হয়েছে।

তবু মনে হয় অণিমার এবাড়ির কিছু মানুষের মনে কোথায় একটা নীরব প্রশ্ন রয়ে গেছে। কিন্তু নোতুন বউ, তাই চুপ করেই দেখে মাত্র।

সরমা ব্যস্ত।

আত্মীয়দেরও বলা হয়েছে। কে এল—কে খেতে বসলো না বসলো তাদের আপ্যায়ণের দিকে নিজে নজর রাখছে।

প্রাণতোষ সরসীবাবুকে বলে—

আপনিও নীচে চলুন বাবা। ওরা আসছেন।

সরসী বাবু যেন বাধ্য হয়েই এটাকে মেনে নিয়েছেন। তবু মনে মনে সায় দিতে পারেন না। বলেন—আবার আমাকে কেন? তোমরা তো রয়েছো সবাই।

প্রাণতোষ বলে—তবু আপনি একটু দাঁড়াবেন বাবা। পিসে-মশাই অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা আসছেন, আপনাকে না দেখলে তারা কি ভাববেন। তাছাড়া বৌমার অফিসের বড়সাহেবও আসবেন।

সরসীবাবু ম্লান হাসি হেসে বলেন—অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকলেও মুখ বুজে কাজ করে যেতে হবে সব সময়? বলছো যাচ্ছি, তবে এসব আমার ভালো লাগছে না প্রাণতোষ।

সরমাও শুনেছে কথাটা। তবু বলে সে—তা করতে হয় বাপু!

আত্মীয় মহলে এ নিয়ে দুচার কথা উঠেছে। অবশ্য সেটা তাদের মধ্যেই আলোচিত হয়। বালিগঞ্জের পিসীমা এসেছেন ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে। পিসেমশাই নিরীহ ধরনের লোক। একপাশে বসে আছেন। ওদিকে ভবানীপুরের মাসী, বৌবাজারের রাঙ্গাদিদের মধ্যে তখন চাপা আলোচনা সুরু হয়। পিসীমা বলে।

—বলো না দিদি। জাতপাত আর মানলো না ঠাকুরজামাই, বলেন পণ্ডিতলোক।

নতু মাসী বলে—তবু যদি সুন্দরী মেয়ে হতো। মেয়ের বয়সের তো গাছ পাথর নেই।

হঠাৎ সরমাকে আসতে দেখে থামলো তারা। পিসীমা বলে।

—খাসা বৌ করেছো, কে বলবে এত লেখাপড়া জানা মেয়ে। সুখী হোক বাছা।

সরমা বলে—ওই আশীর্বাদই করো দিদি। তা খেতে বসবে তো এই ব্যাচ হয়ে গেলে। ঠাকুর জামাইকে নিয়ে বসে পড়ো। যাই ওদিকে দেখছি। সুধাদি—তোমরাও বসে পড়ো।

সরমা চলে যেতে আলোচনার জের সুরু হয়। সুধামাসী বলে।

—কত্তার মুখখানা দেখলাম তেলো হাড়ি হয়ে আছে। গিন্নীতো সব সামাল দিচ্ছে।

পিসীমা বলে ওঠে—দেবে না? চাকরে বৌ—অফিসার। অনেক দেখেছি বাছা। বলছিলাম, না এলে কথা হবে তাই এলাম। তা বাছা গিয়ে গঙ্গাস্নান না করতে হয়। কে জানে কি জাত—

তাদের আলোচনাটা বেশ জমে উঠেছে। নতুন বৌ-কত্তা-সরমা-বড় ছেলে-বড়বৌ এর মুখ শুক্‌নো সব বিষয়ই আসছে একে একে। এমন সময় শিবুর ডাকে সব আলোচনা মুলতুবি রেখে ওরা ঝেড়ে পুড়ে উঠেছে, শিবু শোনায়।

—এই ব্যাচে বসে পড়ো পিসী, পিসেমশাই, সুধামাসি না হলে দেরী হয়ে যাবে!

অবশ্য তার আগেই অনেকেই এই ডাক-এর জন্য মুখিয়ে ছিল। বিয়ে বাড়িতে এসে এই ডাকটাই যেন তাদের কাছে একমাত্র প্রধান ডাক। তারাও ঝেড়ে পুড়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে সরু পথটায় গুঁতোগুতি করে এগিয়ে চলেছে। সব ভদ্রতার মুখোস যেন খুলে গেছে এই ব্যাচে বসার জন্য। পিসীমা ততক্ষণে তার ছত্রভঙ্গ নাতি

নাতনীদের হাঁক-ডাক সুরু করে—মুদো-পটলা-সুকু-বোঁচকা-ঘণ্টা কইগো—তুমি কোথায় ? চল বাপু !

মাসীকে দেখা যায় না। মাসী মেসোকে নিয়ে তার আগেই ম্যানেজ করে গিয়ে ওদিকের চেয়ার দখল করেছে। ছাদে তখন মিউজিক্যাল চেয়ার রেস সুরু হয়েছে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে।

মিঃ বোস এসেছেন। না এসে পারেন নি। অফিসের অনেকেই এসেছে। মেয়েদেরও বলেছিল অণিমা। মিঃ বোসকে দেখে অণিমা উঠে এসে প্রণাম করে, অনুতোষও।

মিঃ বোস দেখছেন ওদের। এ যেন নোতুন অণিমা। সব মেয়ের জীবনে এই রাত্রির প্রস্তুতি চলে মনে মনে। তাই নবরূপে বিকশিত হয় সে এই লগ্নে। বেনারসী পরে ফুলের সাজে যেন এ কোন মহিমাময়ী বেশে সেজেছে সে। অভিজিৎও এসেছে। অণিমা বলে মিঃ বোসকে।

—আপনি এসেছেন কাকাবাবু ?

মিঃ বোস বলে—এলাম অণিমা আজ রতন নেই, সে থাকলে সব চেয়ে খুশী হতো অণিমা। আজ তার কথাই মনে পড়ে।

অণিমার দুচোখ জলে ভরে আসে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—অভিজিৎবাবু এসেছেন, খুব খুশী হয়েছি। নিবু, সেবা, রেবা—ইস্ এসেছো তাহলে ?

অনুতোষকে অণিমা বলে—তুমি এদের নিয়ে বসিয়ে দাও। অভিজিৎ বলে—ওর জন্য ব্যস্ত হবেন না মিসেস চ্যাটার্জি। অনুতোষ-বাবুর তো দেখছি অল এ্যাটেনশন !

মিঃ বোস বলেন—তোমরা থাকো অভিজিৎ। বড় গাড়ি দুটো রইল, সবাইকে পৌঁছে দেবে। আমি চলি অণিমা। রাত্রে এসব খাই না—শুধু দুধ ফল জানোই তো !

বড় ঘরটায় কনেকে সাজিয়ে বসানো হয়েছে। মেয়েরা ভিড়

করেছে। করবীই বলে—বৌদির অফিসের বড়সাহেব। অন্যান্য অফিসার টফিসার ওরা।

একটা সমীহের ভাব সহজ আবহাওয়াটাকে যেন ভারি করে তোলে। অণিমা করবীর দিকে চাইতে থেমে যায় সে। মনে হয় বৌদি এসব ব্যাপারটাকে পছন্দ করে নি।

বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ থেমে গেছে। কলকাতার বিয়ে বাড়ির এই বৈশিষ্ট্য। গোলমাল বেশী হয় সত্যিই, কিন্তু এর স্থায়িত্বও কম। দেশ গ্রামের বিয়ে বাড়ির গোলমালের মত এক নাগাড়ে স্থায়িত্ব এখানে নেই।

নিমন্ত্রিতদের ভিড় কমে গেছে। উৎসব শেষে পড়ে আছে রাস্তায় এঁটোপাতার স্তূপ। তাকে ঘিরে ভিখারী আর কুকুরের দলের সহাবস্থান চলেছে। পথ নির্জন। সানাই-এর সুর থেমে গেছে। স্তব্ধ রাত্রি নামে এ বাড়িতে। বাইরের আলোক সজ্জাও নেই আর।

ক্লান্ত মানুষগুলো যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে।

এই উৎসব শেষের একটি বেদনার সুর আছে, অণিমা চুপ করে সেই সুরটাই যেন শুনছে! তবু এ ঘরের খাটে ফুলের মালা, নোতুন বিছানায় ফুল ছড়ানো। ক্লান্ত অণিমা ফুলসাজ খুলে বেনারসী শাড়ি ছেড়ে সহজ হবার চেষ্টা করে। এতেই সে অভ্যস্ত। একদিনের ওই আড়ম্বর প্রচারের কি প্রয়োজন, এমনি অনুষ্ঠানের কি দরকার তা বোঝেনা সে।

অনুতোষকে দেখে চাইল—কি ভাবছো?

অনুতোষ ওকে কাছে টেনে নেয়। মনে হয় অনুতোষের এ বাড়ির নীরব উপেক্ষাটাকে অণিমা যেন বুঝেছে। জোর করে অনুতোষ অণিমাকে এখানে এনেছে এদের মতের বিরুদ্ধে তাই যেন নিজেকে আজ অপরাধী মনে করে সে।

অণিমা ওদিকে গেল না। তার কোন অনুযোগও নেই। সেও বুঝেছে, এদের পুরোনো সংসারে আঘাত সে দিতে চায়নি, কিন্তু

ফেরাতে পারেনি অনুতোষকে। তার জন্যই যেন এদের এই আঘাত দিয়েছে সে, তাই তার ভালোবাসার জন্যই তাকে এই আঘাতকে মেনে নিয়ে সহজ করে তুলতে হবে। এ ঘরকেই আপন করে নেবে সে।

অণিমা বলে—কই কিছুইতো ভাবছিনা।

—তবে চুপ করে আছো কেন? অনুতোষ ওকে কাছে টেনে নিয়ে অপরাধীর মতই কুণ্ঠিত স্বরে বলে—তোমাকে অনেক কষ্টের মধ্যেই নিয়ে এলাম অণিমা।

অণিমা বলে উঠে—কষ্ট কি গো! দেখবে সবকিছুই সহজ হয়ে উঠবে। এটাতো আমারও বাড়ি। এ নিয়ে তুমি কিছু ভেবোনা। ওসব আমার উপর ছেড়ে দাও।

অনুতোষ জানে অণিমার সে যোগ্যতা আছে। তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করে সে। বলে—এই কথা বলবে তা জানতাম অণিমা। আমি সত্যিই তোমার কাছে ঋণী।

অণিমা স্বামীকে বাধা দেয়।

—আজকের দিনে ওকথা বলতে নেই।

হঠাৎ অনুতোষের খেয়াল হয়। বলে সে।

—একটু দাঁড়াও।

সে দরজা-জানালা পরীক্ষা করে নেয়, খাটের তলাটাও দেখছে। অণিমা অবাক হয়—কি করছো?

হাসে অনুতোষ—সংসারে এসব তো অন্যের বেলায় করেছি। ফুলশয্যার রাত। কে কোথাও রয়েছে কিনা একটু দেখে নিই বাপু।

হাসছে অণিমা। অনুতোষ আলোটা নিভিয়ে ওকে কাছে টেনে নেয়। এতদিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষা যেন তার সার্থক হয়েছে।

নীলেশ নিতাইও এসেছিল এবাড়িতে বৌভাতের নেমতন্নে। নিতাই বলে—না দারুণ খাইয়েছে রে নীলু।

নীলেশও দেখেছে এ বাড়ির ব্যাপারটা। সরসীবাবুকে প্রণাম করতে অনুতোষ পরিচয় করিয়ে দেয়—বাবা, আমার ভাই!

—আ! সরসীবাবু একবার চাইলেন মাত্র। আর কোন কথা বলেন নি।

নীলেশ সরে এসেছে। দেখেছে এবাড়ীর কর্ত্রীকেও। সরমাকে প্রণাম করতে সরমা বলে—এসো বাবা!

অণিমাও উঠে এসেছে নীলেশকে দেখে। এতদিন পর ওকে এভাবে ছেড়ে এসেছে অণিমা। তাই খবর নেয়।

—ভালো আছিস তো? নিতাইদাকে দেখা করে যেতে বলিস! খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

সরমা দেখেছে অণিমা ওই ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। তাই বলে ওঠে সরমা—বৌমা এসময় লোকজন দেখা করতে আসছে, তুমি উঠে এলে কেন? যাও বাছা। ভাইতো আর দেশান্তরী হচ্ছে না। কথাবার্তা পরে হবে।

নীলেশ চুপ করে থাকে। অণিমার মুখে নীরব বেদনার ছায়া ফুটে ওঠে। তবু এবাড়ির নোতুন বৌ, শাশুড়ীব কথায় বলে।

—যাচ্ছি মা।

এই শাসনে সে এতদিন অভ্যস্ত ছিল না। তবু এটাকে মেনে নিতে হয়। নীলেশ অনুতোষের সঙ্গে ছাদে উঠে গেল। মনটা ভালো নেই নীলেশের। হঠাৎ মনে হয় এত দিন পর যেন দিদিটা পর হয়ে গেল।

নিতাই-এর মুখে ওই অণিমার শ্বশুর বাড়ির গল্প শুনে বলে নীলেশ—গণ্ডে পিণ্ডে গিলে এসেছো বুঝি? দুটো ট্যাবলেট খেয়ে নাও। নাহলে কাল সামলাবে কি করে? যাও ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়োগে, রাত হয়েছে।

নিতাই একটু চুপ করে যায়। বলেছে—ঠিক আছে বাবা। যাচ্ছি।

নীলেশ হঠাৎ শূন্য ঘরের পাশে এসে দাঁড়ালো। দিদির ঘরটা আজ খালি। কেউ নেই।

এতকাল ধরে দেখে আসছে নীলেশ ওই ঘরের মানুষটিকে। তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, দুজনে অনেক সুখে দুখে বড় হয়েছে। আজ দিদি নেই।

সে চলে গেছে তার নিজের ঠিকানায়।

—ধ্যুস। নিজেই যেন চমকে উঠে নীলেশ। কি সব আজে বাজে কথা ভাবছিল সে। তবু শূন্যতাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। তাই যেন পড়াশোনার মধ্যেই সে ডুবিয়ে দেয় নিজেকে। জীবনে এই তার একমাত্র করণীয় কাজ। এই দিয়েই দিদির শূন্যতাকে সে ভুলতে চায়।

উৎসবের পানপাত্রের বাড়তি সফেন উচ্ছলতা মুছে গেছে। এ সংসারের সাদামাঠা রূপটা ফুটে উঠে অণিমার চোখে। যা তার কাছে নোতুন অদেখা অচেনা।

এতকাল বাবা মায়ের সংসার ছিল, পোষ্যও কম।

নীলেশ তখন ছোট।

মা মারা যাবার পর অণিমা নিজে তাদের সংসারের হাল ধরেছিল। বাবা সে আর নীলেশ। নিতাইদা ছিল মূল কর্ণধার। সংসারের এলোমেলো ভাবটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।

এবাড়ির বন্দেজী ব্যাপারের সঙ্গে তার মিল নেই। পুরোনো বাড়ির জীবন যাত্রার রূপ আলাদা।

ভোর থেকে এবাড়ির উনুনে আঁচ পড়ে। ঝি মানদা উঠানের একপাশে চৌবাচ্চার ধারে এককাড়ি এঁটো বাসন নিয়ে বসে বসে গজ গজ করছে, এক চিলতে আকাশ উনুনের কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে যায়।

সুতপা উঠে পড়েছে। সরমা এই বাড়ির সজাগ প্রহরীর মত সকলের শেষে বিছানায় যায়, ওঠে সকলের আগে।

সকালে চায়ের হাঙ্গামা আছে।

সুতপা তাই নিয়ে ব্যস্ত। সরমা এদিক ওদিক চেয়ে বলে।

—মেজবৌমাকে দেখছিনা? ভোর থেকে রাজ্যির কাজ বাকী সে তো একটু হাত লাগাতে পারে।

সুতপাও দেখছে অণিমা একটু বেলাতে ওঠে। করবীই তার ঘরে চা পৌঁছে দেয়। কথাটা বলতে সরমা একটু অবাক হয়।

—অ মা! পাঁচজনের সংসারে এসব কি চলে? এতকাল যা সেজেছে করেছে, এ বাড়িতে থাকতে গেলে এসব মেনে চলতে হবে। কথাটা বলে দিও ওকে বড়বৌমা।

সরমা ইচ্ছে করেই বেশ গলা তুলে কথাটা বলেছে, যাতে করে যার উদ্দেশ্যে বলা কথাটা যেন তার কানে যায়, করবী তবু মাকে থামাবার চেষ্টা করে।

—কি বলছো মা! চুপ্ কবো।

সরমাও গলা চড়িয়ে বলে—কেন? চুপকরে থাকতে হবে কেন? একজন খেটে খেটে মরবে আর একজন চুপচাপ বসে থাকবে সংসারে, এ কেমন কথা!

অণিমার একটু বেলায় ওঠা অভ্যাস। তাকে রাত জেগে পড়াশোনা করতে হয় তাই। তাছাড়া কাজও তেমন কিছু ছিলনা। নিতাই সামাল দিত সবদিক।

এখানে বিয়ের পর এসে সেই অভ্যাসটা ভোলেনি। কয়েকদিন হয়ে গেছে। ছুটির এখনও ক'দিন বাকী। অণিমার ইচ্ছে ছিল বিয়ের পর কয়েকদিন তারা দুজনে পুরী না হয় দার্জিলিং-এ কোথাও যাবে কিন্তু সে কথা জানাতে সরমাই বলে—এখন আর এসব কেন? যেতে হয় পূজোর ছুটিতে যাবে।

অণিমা কিছু আর বলেনি। অনুতোষ চুপ করে থাকে। তার মনে হয় এবাড়িতে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু নেই। অণিমাই যেন সান্ত্বনার সুরে বলে—ওরা বলছেন এখন থাক।

অনুতোষ জানায়—ঠিক আছে।

মায়ের কথাটা তার মনে আঘাতই করেছে। তবু চুপ করেই রইল সে।

সকালে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে ওরা। দিনের মধ্যে এইটুকু সময় ভালো লাগে অনুতোষের। জানলা দিয়ে একফালি সকালের আলো এসে ঘরে পড়ে, সামনে মিত্তিদের পুরানো বাগানে বকুল নাগেশ্বর ফুল ফোটে এখনও, বাতাসে তার ভিজে সুবাস লুকিয়ে ছাপিয়ে এঘরে হানা দেয়। সকাল আর রাতটুকু যেন তাদের কাছে মিষ্টি হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সরমার ওই কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে অণিমা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল। কানে আসে এবাড়ির মেজ বৌ-এর বিচিত্র ব্যবহার সম্বন্ধে অনুযোগটা।

অণিমা উঠে দাঁড়ালো। অনুতোষও শুনেছে কথাটা। দেখছে অণিমাকে। অনুতোষের ভয় হয় ও বোধহয় মায়ের কথার প্রতিবাদ করবে।

—অণিমা।

অণিমাও ভেবে নিয়েছে এর মধ্যে তার সিদ্ধান্তের কথা। এ বাড়ির কাঠামোতে তার এই ব্যবহারটা যে ঠিক নয়, মানায় নি সেটা মেনে নিয়েই বলে—আমি একটু যাচ্ছি। সত্যিই বড়দির একা অসুবিধা হয়। যে ক'দিন ছুটিতে থাকি একটু হাত লাগাতে হবে বৈকি।

অনুতোষ ভাবেনি অণিমা এমনি করে এবাড়ির ওই শাসনটুকুও মেনে নেবে। তাই খুশীও হয় সে। অণিমা বলে।

—তুমি স্নান করার আগে ডেকো, প্যান্ট জামা বের করে দেব। আমি আসছি।

সুতপা করবী আর সরমার মাঝখানে শিবু এসে পড়েছে। সে-ও শুনেছে কথাটা। শিবু চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে টোষ্টএ কামড় দিয়ে বলে—তা বাপু সাতসকালে এত চেঁচামেচি কেন? বাব্বা সবে মেজবৌদি দুচারদিন এ বাড়িতে এসেছে একটু ট্রেনিং সারমন এসব দিয়ে ট্রেণ্ড করো তা নয় একেবারে চার্জ করলে তো টিকবেনা মাদার।

সুতপা চাইল শিবুর দিকে। সরমা ফুঁসে ওঠে—তোকে কে কথা বলতে বলেছে ?

—তুমি মাদার। যে ভাবে ভয়েস থ্রো করছো তাতে পড়াশোনা অঙ্ককষা ড্রইং করা সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে।

হঠাৎ অণিমাকে আসতে দেখে থেমে গেল ওরা। সরমা দেখছে অণিমাকে। ও এসে তরকারীর ঝুড়িটা টেনে নিয়ে বলে—কি কি আনাজ কুটবো দিদি ?

সুতপা মনে মনে একটু খুশীই হয়েছে। বলে সে—আলু কফির তরকারী, পালংশাক আর মাছের ঝোলের আলু কাটতে হবে। করবী একটু দেখিয়ে দেনা, আমি ভাতটা নামাচ্ছি।

সরমা বলে—এখানের কাজ-এর ফাঁকে বড় বৌমা—তোমার বাবার চিনিছাড়া চা আর বিস্কুট পাঠিয়ে দিও। যাই ওর পুজোটুজো হল কিনা দেখি।

শিবু দেখছে মেজ বৌদিকে। ওযে এসব কাজ করে নি তা বোঝা যায়। হেসে ফেলে শিবু—দেখো যেন আবার আঙ্গুল কেটোনা বৌদি। অপিসে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেবে ?

হাসছে অণিমা—রীতিমত অভ্যাস আছে মশাই। যাও দিকি পড়াশোনা নেই—মেয়েদের মধ্যে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসো কেন ইন্‌জিনিয়ার সাহেব। এটা তোমার কারখানা নয় !

শিবু বলে—এখনও হইনি ওটা, ততদিন বসেই থাকি তবে বাবা, তোমাদের অধিকারে হাত দিতে চাইনে। এ্যাই বড় বৌদি। আর একটু চা হবে ? দাও না, চাটা নিয়ে সরে পড়ছি।

প্রাণতোষ শান্ত ধরনের মানুষ। সময়মত খেতে বসে টাইমে অপিসে যায়। প্রাণতোষ দেখছে এবাড়ির ব্যাপার। বেলা হয়ে গেছে। কোনরকম খেয়ে উঠে ঘরে এসে দেখে তার জামা রুমাল টিফিনের বাক্স মায় পানের ডিবে কিছুই যথাস্থানে নেই। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা দৌড়ে চলেছে। সুতপারও দেখা নেই।

ক'দিন থেকে দেখছে প্রাণতোষ সুতপাও যেন ইচ্ছে করেই

এসব ব্যাপারেও অবহেলা করে তার অসুবিধার সৃষ্টি করছে। বাধ্য হয়েই প্রাণতোষ রান্না ঘরের দাওয়ায় এসে হাঁক দেয় সুতপার উদ্দেশ্যে।

—শুনছো ?

করবী অণিমা তখন বাকী তরকারী কাটার কাজ শেষ করে কি কথা বলছে। সুতপাও দেখছে ইদানীং করবী যেন মেজ বৌদিকেই বেশী খাতির করে। অবশ্য তার কারণও আছে। করবী বলে।

—মেট্রোতেই চলো বৌদি : বেশ দলবেঁধে যাবো।

হাসে অণিমা—আমি যাবো কি ? তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে তুমিই যাও। টাকাটা আমি দেব।

করবী মনে মনে খুশী হলেও মুখে বলে—তাতে কি ! চলো না। সরমা এরমধ্যে প্রাণতোষের ডাক শুনে এসেছে। সুতপাকে কিছু বলার আগে সুতপাও রান্নাঘর থেকে বেশ একটু জোর গলায় বলে।

—আগুণের আঁচে তেতে পুড়ে মরছি। আমার কি চারখানা হাত যে সব কাজ একসঙ্গে করবো ?

প্রাণতোষ থমকে যায়। সুতপা টিফিন-এর কৌটায় খাবার পুরে এবার বের হয়ে এসে বলে স্বামীকে—চলো দেখছি ! যেদিকে না দেখবো অমনি সোরগোল পড়ে যাবে।

সরমাও দেখছে ব্যাপারটা। এ বাড়ির পরিবেশ একটা চাপা বিক্ষোভ আর বিরক্তিতে যেন ভরে উঠছে। রাগটা পড়ে অণিমার উপরই।

ব্যাপারটা খেয়াল করেনি অণিমা, করবীর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া এসব ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতাও নেই। সরমার কথায় চাইল অপরাধীর মত চাহনি মেলে। সরমা বলে ওঠে কঠিন স্বরে—শ্বশুর ভাশুরের সামনে নোতুন বৌ-এর একটু লজ্জা রাখতে হয়, ঘোমটা দিতে হয় তাও জানোনা বাছা ? এসব শিক্ষে সহবৎ তো একালের মেয়েদের নেই। শেখো বুঝলে।

অণিমা একটু লজ্জায় পড়ে অপরাধীর মত ঘোমটা তোলবার

চেষ্টা করে। সরমার চোখ কান সবদিকেই। হঠাৎ উনুনের ডালের কড়াই-এর দিকে চেয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকেই বলে—ওমা ডালটা যে পুড়ে গেল বাছা, বড় বৌ নেই—কোথায় যে গেল, একটু জল ঢেলে দেবে কেউ।

অণিমাই ডালের ওই বিপদের গুরুত্ব বুঝে সামনেই জলের ঘটিটা নিয়ে কড়াই-এ দেবার জন্য উঠতেই সরমা এবার হাঁ হাঁ করে ওঠে।

—ওমা, বিছানার আকাচা কাপড়েই ডালে জল দেবে নাকি? জাতপাত আর কিছুই রইল না। সরো বাছা—

সরমা নিজেই ডিঙ্গি পেড়ে ছুৎ মার্গ এড়িয়ে গিয়ে ডালে জল দিয়ে বের হয়ে এসে চলে গেল গজ গজ করতে করতে। অণিমা অপরাধীর মত ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল—মেজ!

শিবু কলেজ বের হচ্ছিল সেও দেখেছে ব্যাপারটা। এগিয়ে এসে বলে—এদের পাল্লায় পড়ে তোমার দফা শেষ হবে দেখছি। তুমি রান্নাঘরের মধ্যে সেঁদিও না। যা পারো বাইরে বাইরে করো। বুঝলে। আমাদের স্যার আর ম্যাডাম এখনও উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, এটা ভুলো না।

শিবতোষ বের হয়ে যাচ্ছে। অণিমাও শুনেছে ওর কথাটা। হয়তো জাতের অদৃশ্য উঁচু নিচু বিধিনিষেধ রয়ে গেছে শাশুড়ীর মনে। তবু অণিমার মনে হয় এটা তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। শুধোয় সে শিবুকে।

—কলেজের কি দুখানা বই-এর কথা বলছিলে কাল?

শিবু এগিয়ে আসে। এ-বাড়ীর বাইরের ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে এরা হিমসিম খায়, শিবু জানে তার পড়ার খরচ কতকষ্টে যোগাতে হয় এদের। তবু কিছুটা স্কলারশিপ থেকে তোলে সে। কিন্তু সব বই কনার সামর্থ তার নেই। শিবু বলে—আরে ও এমনি বলছিলাম—বদেশী বই—অনেক দাম! ধরো প্রায় দুটোর দাম পড়বে দুশো-াড়াইশো টাকা।

অণিমা বলে—ওটা পরে দেখা যাবে। বই-এর নাম—অথরের নাম সব দিয়ে যাও।

শিবু একটু অবাক হয়ে দেখছে তাকে। একে যেন এড়াতে পারবে না সে।

অণিমা এ বাড়িতে যেন বন্দিনী হয়ে আছে ছুটির ক'টা দিন। আগেকার সেই স্বাধীন মুক্ত জীবন এ নয়। কিছুটা জড়সড় হয়ে থাকতে হয়। গান গাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। ওবাড়ি থেকে হারমোনিয়াম তানপুরা তবলা এনেছিল, হারমোনিয়ামটা বাক্সবন্দী হয়ে রয়ে গেছে। তানপুরাটা খোল থেকেও বের করেনি।

সুতপার ঘরে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে, সুতপা দুপুরের খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নেয়। আর সুতপার সঙ্গে গল্প করার মত পুঁজি অণিমার নেই। সুতপা শোনায় এ পাড়ার নানা বাড়ীর অনেক কুৎসা—চাপা অন্ধকারের কাহিনী। মিত্তির কত্তার নাকি এখনও রক্ষিতা আছে, তাই নিয়ে বুড়ির সঙ্গে গোলমাল বাধে মদ গিলে; আর মেয়েটাও তেমনি।

অণিমা উঠে আসে। ওসব কথা ভাল লাগেনা তার। ক্লান্ত দুপুরবেলা কাটতে চায় না। পথ চেয়ে থাকে কখন বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামবে। এ যেন দিনভোর এক প্রতীক্ষা।

অনুতোষ ফেরে এখন সকাল সকালই। অনুতোষ বলে।

—উঃ, বিয়ে করে দেখছি এবার নিজেই ফাঁদে পড়ে গেলাম! ক্লাব, বন্ধু-বান্ধব সব শিকেয় উঠেছে। সন্ধ্যার পরই ঘরে ফিরতেই হবে!

হাসে অণিমা—না ফিরলেই পারো; ভালো না লাগে—

এ যেন কি এক অভিমান ভরা সুরেই কথা বলছে সে অনুতোষ বলে।

—একা একা মুখ বুজে থাকো পথ চেয়ে—

—পথ চেয়ে থাকতে বয়ে গেছে। কতো কাজ আমার! অণিম পাকা গিন্নীর মতই কথাটা শোনায়। অনুতোষ দেখছে ওকে।

বলে সে—গান টান নিয়ে থাকলেও পারো ?

কথাটা ভেবেছে অণিমাও। করবীও গান শিখতে পারে।

শিবতোষও এসে জোটে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এ ঘরেই। করবীও এই আড্ডায় না এসে পারে না। শিবুর কাছে মেজবৌদি যেন এবাড়ির মুখ বুজে থাকা গম্ভীর পরিবেশে একটি উজ্জ্বল বিন্দু। শিবু বলে—শুনেছি খুব ভালো গাইতো বৌদি, তা শুনলামই না। করবীটাও কোন কম্মের নয়। কথা বলতে বলো—পাড়ার খবর দিতে বলো—টেপরেকর্ডের মত বকে যাবে। একটু গান কান-এর চর্চা কর করবী, মেয়ে দেখতে এসে এখন প্রথম আইটেম হচ্ছে—মেয়ে গান টান জানে কিনা ; আরে বাবা মেয়ে যেন গিয়েই শ্বশুর বাড়িতে গীতকণ্ঠে প্রবেশ করবে।

হাসছে অণিমা।

হঠাৎ প্রাণতোষ এ বাড়িতে ঢুকে এগিয়ে আসছে। ওদের হাসি-হৈ চৈ নীরব বাড়িতে সাড়া তুলেছে। সেই শব্দটা সরসীবাবুর দুর্গেও প্রবেশ করে। সরসীবাবু পূজো সেরে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করছেন, সরমাকে দেখে চাইলেন। শিবু অণিমার হাসির শব্দ শোনা যায়, করবীকে ওরা বোধ হয় ওইসব কথা বলতে করবীও চটে উঠে প্রতিবাদ করছে। সরমা একটু বিরক্ত হয় এই হট্টগোলে। সরসীবাবু বলেন।

—এ সময় এসব কি বড় বৌ ?

প্রাণতোষকে ঢুকতে দেখে চাইলেন সরসীবাবু! প্রাণতোষ ও কথাটা যেন জানাতে এসেছে। ওর ভাবনা আরও বেশী। প্রাণতোষ বলে।

—করবীর পরীক্ষা সামনে, আর শিবুও পড়াশোনা ছেড়ে আড্ডা দিচ্ছে ওখানে, বাড়িতে পড়াশোনার শান্ত পরিবেশটা কি থাকবে না বাবা !

প্রাণতোষও অফিসের কি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। বাড়ি ফিরে সে গোলগাল শরীর নিয়ে নাকে নস্যি দিয়ে স্নায়ুগুলোকে

সতেজ করে কঠিন অঙ্ক—পেনশন-এর বিধি নিয়ে ধস্তাধস্তি করে! কিন্তু ওই হাসি, কথার শব্দে যেন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। সরমার ভালো লাগে না এটা। সে নিজেই তেড়ে হুড়ে উঠেছে। তাই বের হয়ে এল সরমা।

মানদা ওদিকে রান্নাঘরে রুটি বেলছে, দিস্তা কয়েক রুটি, আর গজগজ করে চলেছে। সুতপাও বিরক্ত মুখে রুটি সেঁকছে।

এদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। শিবু একটা কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে। সুকান্তের কবিতা।

হঠাৎ সরমাকে ঢুকতে দেখে থেমে যায় ওদের ওই কলরব। সরমা চারিদিকে ওদের দেখে নিয়ে বলে।

—করবী সামনে তোর পরীক্ষা, পড়াশোনা নেই? শিবু—তোদের কী না পড়েই পাশ করতে হয় রে! অনু তোকেও বলি মাষ্টার ফাষ্টার নেই, সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরে করবীকে নিয়ে একটু বসতে পারিস তো এসব হৈ হল্লা না করে। আর মেজবৌমা সংসারের এসব কথা, আরও সকলের কথা ভাবতে হয় বাছা।

সরমা তার তূণীরের সব বাণগুলোকে শেষ করে এবার দম নিচ্ছে। শিবু বলে ওঠে—আর কিছু বলবে মাদার? হ্যাড ইউ ফিনিশড্!

সরমা চাইল ছেলের দিকে। শিবু বলে—তাহলে আমাকে বলতে দাও, রিলাক্স করা জানো? দিনভোর কাজের পর একটু রিলাক্স করছি। যাও স্যারকে বলোগে—সব ঠিক ঠিকই হবে।

অণিমাই এগিয়ে আসে—চুপ করো ঠাকুরপো; করবী যাও বই নিয়ে এসো। শিবু যাও কাজ করোগে!

অণিমাই ব্যাপারটাকে সামলে নেয়। সরমা একটু অপ্রস্তুতের মত বলে—তাইতো বলছি মা। নিজেই দেখে শুনে এবার ব্যবস্থা করো! আর অনু, তুই বরং জামাটা গায়ে দিয়ে মোড়ের দোকান থেকে তোর বাবার অষুধ দুটো এনে দিবি আয়।

অনুতোষ চলে গেল। শিবু দেখছে ব্যাপারটা। বলে সে।

—তুমি রিয়েলি ফ্যানটাস্টিক মেজো! এক মিনিটে এত বড় যুদ্ধটা শান্ত করে দিলে!

করবী বই আনতে গেছে। শিবু বলে—মেজ কাল গোটা পঞ্চাশ টাকা ম্যানেজ করো'না? কলেজের বন্ধুরা দীঘা যাচ্ছে দুদিনের জন্য—মাকে বললে তো লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে।

অণিমা দেখছে শিবুকে। মনখোলা দরাজদিল একটি তরুণ।

শিবু ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে—অসুবিধা হয় থাক। ওদের 'না' করে দেব। অণিমা দুচোখে কৌতুকের ঢেউ তুলে বলে।

—না, বলি বন্ধু না বান্ধবী কারা যাচ্ছেন?

শিবু শোনায—বিলিভ মি মেজ। ওসবে আমি নেই! নো লেডি বিজনেস বাবা! অল ল্যাডস্।

অণিমা বলে—ঠিক আছে। কাল সকালে নিও।

শিবু খুশীভরে চীৎকার করে ওঠে—জীতা রও মেজো বিয়িং এ দাতাকর্ণ।

—এ্যাই চুপ। ধমকে উঠে অণিমা।

—সরি মেজো। যাই পড়তে বসিগে। অনেক পড়া বাকী।

চলে গেল সে।

ছুটি শেষ হয়ে আসছে অণিমার। দু'একদিনের মধ্যেই অফিসে জয়েন করবে। সকালে স্নান করে বের হচ্ছে অণিমা, এখন থেকে সকালে স্নান করে রান্নাঘরের টুকটাক কাজে সাহায্য করে সে।

হঠাৎ করবীর ডাকে চাইল। করবী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে।

—একবার বাবার ঘরে চলো বৌদি। মনোহর কাকা এসেছেন, ডাকছেন তোমায়।

অণিমা চুল আচড়াচ্ছিল, বলে সে—মনোহর কাকা, কে?

অবাক হয় করবী—গুরুজনের নাম করছো? না: বাবা মা শুনলে তোমার আর বাকী কিছুই থাকবে না। আরে বাবা মনোহর কাকা বাবার অনেকদিনের বন্ধু, চলো না দেখবে গিয়ে।

ওই সবুজ কলাপাতা রং-এর সিল্কের শাড়িটা পরো। নোতুন বৌবলে কথা।

মনোহর বাবুর বেশ গোলগাল ভারিক্কি চেহারা। উট্‌কো বেশ কিছু রোজকার করলে যে প্রাচুর্য আর আত্মতৃপ্তির ছাপ মুখে চোখে সারাদেহে পোষাক আশাকে ফুটে ওঠে মনোহরবাবুর দেহে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। আয়েসী লোক। সরসী-বাবুকে তার পাশে একটা বিবর্ণ ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে হয়।

মনোহর বাবু ওদিকে করবীর সঙ্গে অণিমাকে ঢুকতে দেখে চাইল অণিমা এসে প্রণাম করে ওকে, কিন্তু তার সঙ্গে যে উপস্থিত অন্য গুরুজনদেরও প্রণাম করতে হয় তা ভাবেনি। করবী সেই ইঙ্গিতটা করতে তবে অণিমা প্রণাম করে সরসীবাবু, সরমাকে।

সরসীবাবুরও সেটা নজর এড়ায় নি। শুক্‌নো মুখে বলেন।

—থাক। থাক!

মনোহর বাবু দেখছে অণিমাকে। বলে সে—খাসা বৌমা হয়েছে সরসীদা, শুনেছি বৌমা নাকি এম-এ পাশ। তা বিয়ের চিঠি পেলাম বোম্বাই-এ বুঝলে বৌমা। তখনই আসবো ভাবলাম, তা যা ঝামেলা মিটেও মেটে না। দুটো পয়সার ধাক্কায় লোক লৌকিকতা সামাজিকতাও ভুলে গেছি। ধরো মা—তবে কলকাতা ফিরেই ভাবলাম মাকে একবার দেখে যাই! অণিমার হাতে দামী শাড়ীর প্যাকেটটা এগিয়ে দেন তিনি। অণিমা বলে--আপনারা কথা বলুন, একটু মিষ্টি মুখ না করে যেতে পাবেন না, আমি আসছি।

অণিমা বের হয়ে এল। মানদাকে টাকা দিয়ে নিজে খাবার আনিয়ে নিয়ে যেতে দেখে অবাক হয় মনোহরবাবু—এতো কে খাবে মা!

মনোহরবাবুর পায়ের ধুলো পড়া যেন এবাড়ির মানুষগুলোর কাছে পরম সৌভাগ্যের কথা। সরসীবাবু, সরমা অণিমাকে এভাবে ওই মাননীয় অতিথিকে আপ্যায়ণ করতে দেখে তাই খুশী হয়েছে।

সরমা বলে—বৌমা নিজের হাতে এনেছে, খান্ ঠাকুরপো। কি আর আছে ?

মনোহর বলে—কিছু কমিয়ে দাও মা। এখুনি আবার হাওড়া রেল ইয়ার্ডে যেতে হবে, সেখান থেকে কারখানায়, শান্তি নেই মা। বুঝলে সরসীদা, তুমি বেশ আছো শান্তিতে। অবসর আছে। আর আমাদের ওসব নেই। কি কুক্ষণে ব্যবসার পথে গেলাম !

যাক ! তাহলে ঘর সংসার-এর খবর সব ভালো !

সরসীবাবু বলেন—তবু দু একজন তোমরা পাশে আছো মনোহর তাই এখনও টিকে আছি। দায়ে অদায়ে বুক দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াও। সেবার টুনুর বিয়ের সময় তুমি না থাকলে কোথায় দাঁড়াতাম বলো ?

মনোহর বাবু যে এই পরিবারের অকৃত্রিম বন্ধু এটা অণিমাও অনুমান করতে পারে। তবু মনোহরবাবু বলেন সলজ্জভাবে।

— ওসব বার বার বলে কেন লজ্জা দাও সরসীদা। এ-এমনকি করেছি বলো ? কিছু টাকা দিইছি। এবার ছেলেরা ভগবানের দয়ায় মানুষ হয়েছে, শিবুও দাঁড়াক। তখন না হয় দিয়ে দিও টাকা। এ নিয়ে এত ভাবনা কিসের।

সরসীবাবু বলেন—তোমার ভাবনা নেই তা জানি, ভাবনাটা যে আমার হে। ঋণ রেখে গেলে ওপারেও শান্তি পারো না।

মনোহর কৃত্রিম কোপে ধমকে ওঠে—থামবে তুমি ! এসব কথা শোনাবে তো বলো কেটে পড়ি। কদ্দিন পর এলাম—আর এই কথা ! বৌমা আজ চলি। পরে এসে আলাপ হবে।

সরসীবাবু বলেন—একদিন খাচ্ছো কবে এখানে ?

মনোহরবাবু জানান—হবে একদিন ! মা জননীর হাতে খেয়ে যাবো বৈকি। এখন চলি !

ব্যস্তসমস্ত মানুষ। বের হয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

অণিমা তখনও দেখছে মানুষটিকে। ওর সেই প্রাচুর্য আর ওই উদার ভালোবাসার অতলে যেন একটা অন্যরূপকে দেখেছে সে।

এবাড়ির জীবনের সঙ্গে ওই লোকটি কি একটা অর্থসূত্রে বাঁধা আছে সেটা শুনে অণিমা খুব খুশী হয় নি।

চুপ করে সরে আসছে সে। করবী তখনও বলে চলেছে।

—বিরাট ব্যবসা ওর। ক'টা কারখানা জানো?

অণিমা বেশ কদিন পর অফিস বের হচ্ছে আজ। সকাল বেলায় সুতপা দেখছে ওকে। আজ রান্নাঘরের কাজে বেশীক্ষণ থাকতে পারে নি অণিমা। সুতপা বলে—কুটনোগুলো কুটতে হবে মেজ—চায়ের পাট চুকিয়ে।

অণিমা জানায়—করবীই দেখছে একটু, মানদা দি তুমিও হাত লাগাও বাপু! আজ থেকে তো অফিস!

সুতপা বিরক্তি চেপে বলে—তাহলে আর কি করবে? দেখছি আমিই! একা কত দেখবো জানি না। ওরে করবী টিফিনের লুচি ক'খানা বেশী করে ভাজ, একজন তো বাড়লো।

অণিমা কথাটা শুনে বলে—আমার টিফিন ক্যানটিন থেকে আসে বড়দি।

সুতপা বলে—বাইরের খাবার কেন খাবে, আলাদা করে করতে হবে নাতো। অবশ্য মুখে যদি রোচে সাহেব মেমসাহেবদের।

অণিমা উঠে এল চুপ করে।

অনুতোষ আর সে খেতে বসেছে। মানদা বৌ এবাড়ির সাবেকী লোক। সে দৃশ্যটা দেখে একটু অবাক হয়ে আড়ালে সুতপাকে বলে—ই কি ধারা গ বড়বৌ! শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা হল না, বৌ বসে গেল কত্তাকে নে ভাতের থালার সামনে?

মানদার কাছে এবাড়ির সাবেকী প্রথার সামনে এই দৃশ্য নোতুন আর বিচিত্র বোধ হয়। বলে ওঠে সুতপা।

—চাকরী করতে যেতে হবে কিনা! তাই খেয়ে দেয়েই বেরুচ্ছে দুজনে।

মানদার চমকানি কাটেনি। শুধোয় সে গলা নামিয়ে—কত্তা, গিন্নী জানেন তো গো!

অর্থাৎ সরসীবাবু যে এটাকে মেনে নিয়েছে এটা ভাবতে পারে না সে। মনে হয় সাংঘাতিক একটা কিছুই ঘটেছে এদের পারিবারিক জীবনে, বুড়ির এতকালের সংস্কার ধারণাটাও কেমন বদলে যাচ্ছে।

মধ্যবিত্ত জীবনের এই ভাঙ্গনের কথা—সে এতকাল আগে নিজের চোখে দেখেনি, সেটাকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে সে। দেখছে মানদা—এবাড়ির সকলের সামনে দিয়ে এবাড়ির নোতুন বৌ অন্তঃপুরের সীমানার বাইরে নোতুন এক জগতে চলে গেল।

সরসীবাবুও দেখেছেন সেটা। তাঁর মনে হয় এমনি করেই এত কালের পুরোনো সবকিছু তিল তিল করে বদলে যাবে, গড়ে উঠবে নোতুন একটি সমাজ যার সীমা হবে সীমিত, যেখানে ঠাঁই কুলোবে না বৃহৎ কোন পরিবারের।

সরমার ডাকে চাইল—চান করবে না ?

—যাই ! সরসীবাবু আবার তার জীবনের জীর্ণ খেলাঘরের মধ্যে এসে আশ্রয় নেন।

অণিমা ফিরে এসেছে অফিসে নতুন বেশে। অভিজিৎ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো। দেখছে সে অণিমাকে। এ যেন নোতুন একটি সত্ত্বা। সিঁথিতে সিঁন্দুর মুখ চোখে এসেছে নীরব তৃপ্তির আভাষ। অভিজিৎ বলে—বদলে গেছেন ক'দিনেই।

অণিমা চাইল ওর দিকে, বিচিত্র সেই চাহনি। অভিজিৎ প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলে—আপনার ক'টা ফাইল-এ নোট দিয়েছি, দেখে নেবেন।

ফোনটা বাজছে। মিঃ বোস ডাকছেন ওকে।

মিঃ বোস-এর নজর সবদিকেই। ব্যাঙ্কের বেশ কিছু লোন ঠিকমত আদায় হচ্ছে না। তিনিও তাদের নোটিশ করেছেন, কোন সাড়া বিশেষ মেলেনি। তাই এবার একটা ব্যবস্থা করতে চান।

অণিমাকে ঢুকতে দেখে চাইলেন।

—এসো!

অণিমা জানায়—আজ জয়েন করলাম স্যার।

মিঃ বোস বলেন—কেমন লাগছে নোতুন ঘর? অবশ্য প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে। মানে যৌথ পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক কিছুই করতে হবে। ক্রমশঃ সয়ে যাবে!

অণিমা বলে—চলে যাচ্ছে!

হাসেন মিঃ বোস—চলে যায় যখন তখন কোন প্রশ্ন ওঠে না। ওঠে যখন কোন প্রবলেম আসে। তবে কি জানো—সেদিন বলেছিলাম, সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। এ নেয় সবকিছু, কিন্তু দেয় না কিছুই। কিছু পেতে গেলে এখানে পাবে দুঃখ আর যন্ত্রণা। বাই দি বাই আই হ্যাভ সাম গুড নিউজ ফর ইউ! হিয়ার ইট ইজ!

মিঃ বোস ওর হাতে প্রমোশনের চিঠিখানা এগিয়ে দেন। অবাক হয় অণিমা—স্যার! এই রেসপনসিবল পোষ্টে আমি পারবো?

হাসেন তিনি—কেন পারবে না। পার্সন্যালিটি আছে ক্যালিবার আছে, ইউ ডিজার্ভ দিস ষ্ট্যাটাস! কনগ্রাচুলেশনস! এবার একটু উঠে পড়ে লেগে কাজগুলো সুরু করে দাও।

অভিজিৎকেও ডাকানো হয়েছে। ওকে ঢুকতে দেখে মিঃ বোস বলেন—অভিজিৎ, আই এম গিভিং ইউ এ্যান এবল্ অফিসার টু ডু দ্যা জব! অণিমা করবে ওগুলো। তুমি দরকার মত দেখিয়ে দেবে।

অভিজিৎও খুশী হয়—ভালো হবে স্যার। রাইট সিলেকসন্।

হাসছেন মিঃ বোস।

অণিমা দেখছে ওকে। তার বিয়ের পর যেন কিছু বেশী টাকা পৌঁছিয়ে দেবার জন্যই তাকে এই প্রমোশন দিয়েছেন উনি। অণিমা বলে—চেষ্টা করব স্যার।

মিঃ বোস অভয় দেন—দ্যাট উইল ডু। এনি ডিফিকালটি আই এম হিয়ার!

মেয়েমহলেও খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। টিফিনের সময় মেয়েদের রিটায়ারিং রুমে হৈ চৈ চলেছে। এর মধ্যে ক্যারামও পড়েছে। সবিতা ইদানীং খুব ব্যস্ত। একটা হাল্‌কা নীল রং-এর নোতুন সোয়েটার বুনছে। নিবেদিতা রেবা লতিকারাও রয়েছে। নিবেদিতা বলে—বুঝলে লতুদি, লোকের স্ত্রী ভাগ্যে ধন, আর অণিমাদিব স্বামীর ভাগ্যে প্রমোশন। কি লাক্ তোমার।

সবিতা বলে উঠে—সি ডিজাভস্ ইট। তোমবা চাকরী করতে এসে তো ফাঁকি দাও।

মেযেরা চমকে উঠে। অণিমাই বলে—ছাড়োতো ওসব কথা। লতিকা তুমি বিযেতে গেলে না কিন্তু—

লতিকা বলে—মেযেটাব অসুখ। ফেলে যেতে পারলাম না।

সবিতা উঠে চলে গেল। নিবেদিতা বলে।

—অনেষ্ট ওযার্কার। সোয়েটার বুনছেন আবার।

—কার জন্যে রে? কে আবার নোতুন শিকার হলেন? শুধায় রেবা।

অণিমা বলে—থামো দিদি তোমরা। এবার ফাংশনে কি করছো বলো? এবার যা কাজের চাপ আমি কিন্তু গানও গাইতে পারবো না।

নিবেদিতা বলে—ভয় নেই। কর্তার কাছ থেকে পারমিশন আনিয়ে নেব। এখন থেকেই এতো?

হাসছে ওরা।

সবিতার কাছে জীবনটা যেন কঠিনতর হয়ে উঠেছে। চারিদিকে দেখেছে একটা শূন্যতা। অণিমার সিঁথির সিন্দুর ওর শান্ত তৃপ্ত চেহারাটার মধ্যে নিজেকে ও যেন অমনি রূপে দেখার স্বপ্ন রচনা করে। এতকাল ঠকেই এসেছে। হয়তো ভুল করেছিল সবিতা, অনেক ছেলেই তার কাছে এসে আবার সরে গেছে। শূন্য রয়ে গেছে সবিতার জীবন।

এবার তাই অনেক হিসাব করেই এগোচ্ছে সে। আয়নায়

দেখেছে সবিতা তার মুখে বয়সের আবছা রেখাগুলো যেন এবার প্রকট হয়ে উঠেছে। বেলা ফুরোবার নোটিশ আসছে। তবু সবিতা আশা ছাড়েনি।

ডিলিং সেকশনের হরিপদ নাথকে কেন্দ্র করেই এবার সোয়েটারের জাল বুনছে সবিতা। বোকা বোকা ছেলেটি। নিরীহ গোছের। এ সেকশনে প্রথম আসতে সবিতা ওকেই এগিয়ে গিয়ে বলে।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। ফাইলগুলো আমায় দিন।

হরিপদ ভয়ে ভয়ে বলে—পারবো তো এখানের কাজ? আন্‌ফিট হয়ে যাবোনা তো?

হাসে সবিতা—না, না। কিছু ফাইল না হয় বাইরে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে। আমি দেখিয়ে দেব।

হরিপদও এমনি একটি নির্ভর চেয়েছিল। ক্রমশঃ দেখেছে সবিতাই ওর জন্যে নিজের টিফিন কৌটা থেকে টিফিন বের করে কলা—ডিম—আপেল। হরিপদ মৃদু স্বরে বলে—এসব কেন?

হাসে সবিতা—নাও তো দুষ্টু ছেলে। আর মাপটা দেখি—

সুরু করা সোয়েটারের কাঁটাটা ওর কাঁধে মিলিয়ে মাপ নিতে থাকে। ওর হাতের ওই স্পর্শটুকু হরিপদর মনে কি সাড়া তোলে।

ও যেন তাই মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যায় সবিতার পিছনে।

ইডেনের গাছ গাছালিতে বৈকালের অন্ধকার নেমেছে। হরিপদ ভয়ে ভয়েই এসেছে সবিতার সঙ্গে। ঝিলের ধারে বসেছে সবিতা।

হরিপদ বাড়ি ফিরতে চায়, সন্ধ্যার পর ফিরলে এখনও বাবা ওকে ভারি গলায় শুধোয়—কোথায় ছিলি?

হরিপদর মিথ্যা কথা বলতে বুক কাঁপে। কারণ বাবা পিসীমা বলেন—মিথ্যা কথা বললে নাকি পাপ হয়। হরিপদ বাবাকে ভয় করে। তাই সন্ধ্যার পরই বাড়ি ফিরতে চায়।

—সবিতা দি!

সবিতা সোয়েটার বুনছিল। সেটা বন্ধ রেখে বলে—ছাখো হরিপদ, সবিতা দি বলে ডাকবে না। আমি তো অনেক ছোট। সবিতা বলেই ডাকবে, কেমন ?

হরিপদ ঘাবড়ে যায়। কোন রকমে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যেন ওর হাত থেকে ফিরে যেতে চায় বাড়িতে। সবিতা বলে—এত ভীতু কেন ? ব্যাটা ছেলে ফরোয়ার্ড হবে।

—হবো !

—গুড ! এই তো চাই ! সবিতা খুশী হয় মনে মনে। এমনি একটা কাদার তালকে সে মনোমত করে গড়বে। বলে সবিতা।

—সামনের রবিবার দুপুরে আসছো আমার বাড়িতে। ওখানেই খাবে, কেমন ?

হরিপদ এবার বিপদে পড়েছে। আসার ইচ্ছেও তার নেই, তা নয়। কিন্তু ওদিকে বিপদ। হরিপদ বলে—সেদিন বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি আছে যে, বেরোবো কি করে ?

সবিতা চাপা বিরক্তিতে বলে ওঠে—হ্যাকনিড। সত্যনারায়ণের সিন্নি টিন্নি নিয়ে থাকো কি করে ? চলে আসবে।

—বাবা যে রাগ করবেন।

হরিপদের কথায় সবিতা ওর দিকে চাইল। হরিপদ ভয়ে ভয়ে বলে।

—পরে একদিন সত্যি খেতে আসবো। রাগ করো না মাইরি।

সবিতা যেন এমনি কথার জন্যেই কান পেতে ছিল। খুশি হয়ে বলে।

—না, না। রাগ করবো কেন ?

সবিতার দুচোখে কি ব্যাকুল চাহনি। হরিপদ বলে—বাড়ি যাবো এইবার।

হেসে ফেলে সবিতা ওর অসহায় কণ্ঠে। সবিতা বলে।

—চলো। তবে কথাটা মনে থাকবে তো ? সাহসী বেপরোয়া হতে হবে।

ঘাড় নাড়ে হরিপদ। সবিতা বলে—গুড। তোমার সোয়েটারটার একবার বুকের মাপটা কাল মনে করে দিও। কেমন?

অপিস থেকে বের হবার মুখে অণিমা অনুতোষকে দেখে এগিয়ে আসে। একই এলাকায় দুজনের অপিস তাই আসা যাওয়ার সময় দুজনে একসঙ্গেই আসে। অণিমা ভিড ঠেলে এগিয়ে এসে শুধোয়।

—এ্যাই কতক্ষণ এসেছো?

অণিমার কথায় অনুতোষ পায়ের কাছে দুটো সিগারেটের শেষাংশ দেখিয়ে বলে—প্রায় আধঘণ্টা হলো ম্যাডাম। কি যে কাজ করো!

অণিমা জানায়—তোমাদের মতো অফিস নয় স্যার, খাটতে হয়। তাছাড়া আজ থেকে তো ফুল অফিসার হয়ে গেলাম, নোতুন চার্জ।

—রিয়েলি। অনুতোষ খুশীতে ঝলমল করে ওঠে। হয়তো আবেগ ভরে ওই প্রকাশ্য রাস্তায় ধরে চুমুই খেয়ে ফেলবে, ও সব পারে। এ কথাটা ভেবে আগে থেকেই অণিমা সাবধান হয়ে বলে শাসনের ভঙ্গীতে—এ্যাই। রাস্তায় বেয়াদপি সুরু করবে নাকি? চলো।

অনুতোষ বলে—না। ওটা বাড়ির জন্য তোলা থাক। তাহলে তাড়াতাড়ি ফেরা যাক।

অণিমা জানায়—চলো না একটু নিউমার্কেট ঘুরে যাবো। এককালে এদিকের পথে, রেস্তোরায় সে ঘুরেছে। কলকাতার অনেক তরুণ তরুণীর মনের জগতে এই পথ—এলাকাগুলোর অনেক স্মৃতি জমে থাকে। দিন বদলার সঙ্গে সেই স্মৃতি বিবর্ণ হয়ে যায় জীবনের কাঠিন্যে—তবু কিছু থেকে যায়।

এদের জীবনে সেই কাঠিন্য আসেনি এখনও। অণিমা গত মাসের মাইনে তুলেছে আজ। কথাটা সে আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, তার নোতুন পথের কথা। অনুতোষকেও বলেনি।

অনুতোষ মার্কেটে এসে ওকে কাপড়—শাড়ি, প্যান্ট—শার্ট কিনতে দেখে অবাক হয়।

—এসব কি হবে?

—পরবো। নাও ধরোতো। অণিমা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে। -একটা ট্যাক্সি ধরোনা। কলেজ স্ট্রীট হয়ে বাড়ি ফিরবো।

কলেজ স্ট্রীটে এসে বড় একটা বই-এর দোকানে নেমে যায় অণিমা, প্যাকেট করাই ছিল বই দুটো আগে থেকে ফোনে বলে রেখেছিল তাদের অণিমা। সেটা নিয়ে ওপাশে মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের দোকানে ঢুকেছে। অনুতোষ ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারেনা।

গরদের ধুতিটা দেখে শুনে দাম দিয়ে এবার যেন মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলে।

—উঃ। চলো এবার বাড়ি।

পাশে অনুতোষ চুপ করে ওকে দেখছিল। হাওয়ায় উড়ছে অণিমার চুলগুলো, মুখে লাবণ্য আর ক্লান্তি দুটো মিলে আজকের জীবনের পরিশ্রান্ত একটি মেয়ের আনন্দের ছাপ মেশানো। অনুতোষ নোতুন এক রহস্যময়ীকে দেখেছে। বলে অনুতোষ—কি ব্যাপার বলো তো? এতসব কেনাকাটা করলে?

হাসে অণিমা—কেন। কিনতে নেই?

—কে জানে? অনুতোষ চুপ করে রইল।

আত্মীয় মহলে গুঞ্জরণটা যেন ক'দিনেই বেশ সরবে ছড়িয়ে পড়ে। বালিগঞ্জ, বৌবাজার বেলেঘাটা সর্বত্র ছড়ানো অনেক আত্মীয়। সরসীবাবুকে তারা দেখে ছিলেন সমাজের ধারক হিসেবেই। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আদর্শবাদী। তার ছেলেবৌ এমনি হবে অনেকে ভাবতে পারেনি। তাদের রক্ষণশীল পরিবারে এই ধরনের জাতের বাইরে বিয়ে, আর চাকুরীকরা বৌ নিয়ে কথাটা উঠেছে তাই বেশী করে।

বালিগঞ্জ থেকে পিসীমা আর বৌবাজারের নোতুন মামী দুজনে বৈকালের দিকে বেড়াতে এসেছেন এ বাড়িতে। পিসী বলে সরমাকে।

—ও দিদি। নোতুন বৌকে দেখছি না?

সুতপা জবাব দেয়—সে তো অফিসে।

নোতুন মাসী মাথা নাড়ে—তা বাপু, ঘরের বৌরা আজকাল অফিস টফিস যান বৈকি! আমাদের মনুও বলে এসব এখন দরকার। একার রোজকারে সংসার চলার দিন আর নেই।

পিসীমা ঠাকুর ঘরের বারান্দায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। সরসীবাবু এখানে বসে পূজো পাঠ করেন। বর্তমানে তিনি এদের এই এলাকা ছেড়ে দিয়ে ঘরে রয়েছেন। মেয়ে মহলের আসর বসেছে। পিসীমার আবার জর্দা পানের নেশা, পিসী বাদলরামের বেনারসী জর্দা, মশলাদার সুপারি ছাড়া পছন্দ করে না। নিজের জর্দা এক মুঠো মুখের মধ্যে চালান করে পিসী মন্তব্য করে—

দিন তো অনেক কিছুই বদলেছে, তাহলে বাছা আর ঘটা করে ঘর বাঁধা কেন? ওটা যদি বাঁধতে হয় ছেলেপুলেদের মানুষ করতে হবে, ঘরবাস করতেই হবে। তা নয় বুঝলে বাছা—মেয়েদের সেজেগুজে বেরুনো চাই, আর অফিসে যে কাজ যা করে তাও জানা আছে। ওসব ঢং কে না জানে বাবা, কালে কালে আরও কি হবে।

সরমা চুপ করে থাকে। বেশ বুঝেছে, বাক্যবাণগুলো তার উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হচ্ছে। কথাটা ক্রমশঃ সেও ভেবেছে। অনুতোষের এই জেদকে সমর্থন করেছে বাধ্য হয়েই।

সুতপাও শুনেছে কথাটা।

নোতুন মাসী বলে—তা দিদি কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। বৌ বলতে দিদি তোমার বড় বৌ: আহা লক্ষ্মী, সংসারকে ধরে রেখেছে। মুখে রা কথা নেই।

সরমা জবাব দিল না। এটাও সে অস্বীকার করতে পারেনা।

দৈনন্দিন জীবনের এই চাকাটা নিপুণ হাতে ধরে আছে সুতপাই। আজ তারও বলার কিছু থাকবে।

কথাটা সরসীবাবুও ভেবেছেন। একদিন সুতপা যদি এই জীবনের প্রতিবাদ করে, অণিমার মুক্ত জীবনকে হিংসা করে এবাড়ির শান্ত আবহাওয়ায় ঝড় তোলে, বলার কিছুই নেই। তাঁর এতকালের পরিশ্রমে গড়ে তোলা এই যৌথ পরিবারের পরস্পর সহানুভূতিশীল মনের ভারসাম্যও বিপন্ন হবে। এমনি করেই আজকের সভ্যতা সংসারকে টুকরো করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলেছে।

সরমাও তা জানে।

সরমা বলে—তোমরা বসো ভাই সন্ধ্যা দিয়ে দিই।

সুতপা বলে—মা আপনি বসুন। আমি সন্ধ্যা দিয়ে চা আনছি।

সরমার মেজাজটা ভাল নেই। সে বলে।

—কথাটা মিথ্যে নয় ভাই। ভেবেছিলাম অনুর বৌ আমার বড় বৌ-এর ভার কমাবে। বাড়িতে সেও সন্ধ্যাপিদীম জ্বালবে কন্তু—

হঠাৎ সিড়িতে ওদের পায়ের শব্দ শুনে চাইল সরমা। সন্ধ্যা দিচ্ছে সুতপা। এরা গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করছে। অণিমাও উঠে আসে এদের দেখে। সিঁড়িতে ওর জুতোর শব্দ উঠছে। সরমার মনে ওই শব্দটা কাঠিন্য এনেছে। সরমা বলে।

—জুতো পরে উঠে আসছ যে বৌমা ঠাকুর দালানে? ওটা ছেড়ে এসো! অণিমা ওই কঠিন কণ্ঠস্বরেও গুরুত্ব দেয় না। বিব্রত মুখে হাসতে হাসতে জুতোটা খুলে নীচে রেখে দিয়ে উঠে এল হাতে একরাশ নামী দোকানের প্যাকেট, বড় বাক্স ভীমনাগের সন্দেশ নিয়ে।

অবাক হয় সরমা—ওসব কি?

পিসী, নোতুন মাসীও দেখছে অণিমাকে। অণিমা বলে।

—মাইনে পেলাম, বাবার জন্য গরদের একটা ধুতি, আপনার

পুজোর জন্য গরদের শাড়ি। বড় দিদি, করবীর দুটো শাড়ি, ঠাকুরপোর প্যান্ট জামার কাপড় নিয়ে এলাম। বাবার গরদের ধুতিটায় ঠকলাম কিনা দেখুন তো? একশো সাত টাকা দাম নিল।

সরমার কঠিন মুখে হাসির আভা ফুটে ওঠে। যেন মেঘটা সরে গিয়ে আকাশে একটু আলোর ইশারা জাগছে। প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে তবু বলে,

—এতো সবে কি দরকার ছিল বাছা, ওটা কি?

অণিমা কুণ্ঠিত স্বরে বলে—কিছুই তো দিতে পারিনি ওদের আর এই প্যাকেটায় ঠাকুরপোর দুটো বিলিতি বই।

—তাই বুঝি। খুশী হয় সরমা।

ওই বই এর কথা আগে ও বলেছিল শিবু, কিন্তু কত্তার এখন টাকা নেই। তাই চুপ করেছিলেন তিনি। আজ অণিমা সেই বই এনেছে দেখে সত্যিই খুশি হন।

সরমার হাতে অণিমা একটা খামও এগিয়ে দেয়।

—কি চিঠি মা?

অণিমা জানায়—চিঠি না। সংসার খরচের জন্য কিছু টাকা রেখে দিন মা!

মুখ আলগা থেকে একশো টাকার সবুজ আভা ধরানো কটা নোটও রয়েছে দেখা যায়।

সরমা এতদিন ধরে সংসার চালিয়েছে, এভাবে কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার দুহাত ভরে কিছু দেয় নি। স্বামী ছিলেন গরীব শিক্ষক সামান্য মাইনে, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয়নি। এমনি দামী কাপড়ও আনেনি, হাতে পায়নি এমনি নোটগুলো।

ওর কাছে এ সব নোতুন, তাই এই আনন্দের অনুভূতিটা মনের এতকালের জমাট বাঁধা প্রতিবাদের স্তরটাকে, সন্দেহের কাঠিন্যকে গলিয়ে দিয়েছে।

সরমা বলে—তোমরা বসো দিদি ভাই! আমি আসছি।

—অ বৌমা, তুমি খেটেখুটে এলে, যাও হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম

করো গে। অ বড় বৌ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো যে, চা-খাবারের ব্যবস্থা করো গে। যা না বলবো তা আর হবে না।

সরমা নিজেই দুহাতে ওইসব প্যাকেট জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেল নিজেদের ঘরের দিকে।

সরসীবাবু এসময় চুপ করে বসে বাইরে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চেয়ে থাকেন। দোতলা থেকে বাগান—ওদের বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। এককালে সাজানো কেয়ারিতে ফুল ফোটাতো মালি, রকমারি গোলাপ, গাঁদা—মালতী ফুটতো। বকুল গাছের তলা বিছিয়ে ঝরে থাকতো বকুল ফুল। বাতাস ভরে থাকতো গন্ধে। বাড়িটার চমক ছিল। লোকজন গমগম করতো কর্মচারীদের ভীড়ে। কর্তাদের ফিটন থামতো—ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠতো। রাজকীয় ভঙ্গীতে সাজানো ঘোড়ার গাড়িগুলো যেতো আসতো।

এখন সেই বৃহৎ পরিবারের ভগ্নদশা। বড় বাড়িটা কয়েকটা টুকরো হয়ে গেছে। গাড়ি—ঘোড়া—পাইক বরকন্দাজ নেই। বাগানের বাহারও ফুরিয়ে গেছে। ঘাসে ঢেকেছে কেয়ারী, বাগানের ওদিকে কয়েকটা গাছ কেটে একটা শেড উঠছে। কোন মাড়োয়ারীর ট্রাক আসে ভাঙ্গা লোহালক্কড় ঢাঁই করে ফেলে যায়, আবার চালান যায় কোথায়।

দুচারটে গাছ এখনও টিকে আছে সবুজ স্বপ্ন নিয়ে। ওরাও যেন দিন গুনছে, সেগুলো কেটে হয়তো কারখানার শেড তৈরী হবে। কিছু মাস মাস ভাড়ার টাকার জন্য।

এমনি করে সব ভেঙ্গে যায়। এযেন সেই নিষ্ঠুর ভাঙ্গনকেই তিনি দেখেন। কানে আসে মেয়েমহলের আলোচনার কথা। তাঁর সংসারে যেন এমনি একটি ভাঙ্গনের ছবির কল্পনা করে চমকে ওঠেন তিনি। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচার দিন শেষ হয়ে আসছে।

পায়ের শব্দে সরমার দিকে চাইলেন তিনি। ওর হাতের ওই সব দেখে অবাক হন—কি ব্যাপার? এত জিনিষপত্র?

সরমা খুশি ভরে বলে—মেজবৌমা আজ মাইনে পেয়ে এসব নিয়ে এল।

—মেজবৌমা!

অবাক হন সরসীবাবু।

সরমা ততক্ষণে ফর্দ দিয়ে চলেছে—তোমার গরদের ধুতি, আমার শাড়ি। বড় বৌমার, করবীর জন্যে শাড়ি বেশ সুন্দর দামী জিনিষ এনেছে। শিবুর জন্যে প্যান্টের সার্ট-এর কাপড়, ওর সেই বই দুটোও। আর সংসারের দিকেও নজর আছে বাপু। ঘরখর্চাও দিয়েছে কয়েকশো টাকা। শুনলাম নাকি প্রমোশন হয়েছে। এবার গাড়ি পাবে আসা যাওয়ার জন্যে আর বাড়িতেও টেলিফোন বসবে।

সরসীবাবু স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীকে দেখছেন।

সামান্যতম পাওয়াতেই ওরা খুশী। শুধু খুশী নয় যেন নিজের সত্বাকেও বিকিয়ে দিয়েছে। সরমার এই বিচিত্র মূর্তিটা দেখছেন সরসীবাবু। স্থির কণ্ঠে বলেন—খুব খুশী হয়েছো অনুর মা, নয়?

সরমা স্বামীর শীতল কণ্ঠস্বরে অবাক হয়েছে। বলে সে—

অখুশি হবার কি আছে? হাজার হোক সেও এ বাড়ির বৌ। তার ভালোতে খুশী হবো না।

হাসেন সরসীবাবু। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে তিনি বিচার করে বলেন—ঠিক ভালো বুঝছি না অণুর মা। অবশ্য তুমি খুশী হবে বৈকি! আমার আমলে তো এসব দেখোনি, ভাবতেও পারোনি। আজ এবাড়ির বৌ যদি এসব রোজগার করে আনে তাই নিয়ে খুশী হতে হবে বৈকি!

সরমা স্বামীর এই শুক্‌নো মতবাদকে সমর্থন করতে পারে না আজ। ভেবেছিল সে সরসীবাবুও খুশী হবেন। কিন্তু তা না হতে দেখে বলে সরমা—

এই তোমার দোষ। চিরকাল একপেশে স্বভাবেরই রয়ে গেলে। তুমি বাপু মেজ বৌমাকে দুচোক্ষে দেখতে পারো না। বলি, সেও তো এবাড়ির বৌ। তাকেও তো দেখতে হবে।

সরসীবাবু জবাব দিলেন না।

সরমা ওগুলো রেখে বের হয়ে গেল। তার হয়েছে জ্বালা। নানাজনকে সামলে এই সংসারের হাল ধরে থেকে থেকে সুখের মুখ দেখারও যেন অধিকার নেই।

পিসীমা নোতুন মাসীদের মুখে মেঘ নেমেছে। এক মিনিটের মধ্যে মেজ বৌ যে এমনি একটা কাজ করে এবাড়ির সারা আবহাওয়া বদলে দেবে তা ভাবতেও পারেনি।

ওরা দেখেছে সরমার মুখখানা। কি পাওয়ার আনন্দে ঝলমল করে ওঠে।

পিসী বলে—ও নোতুন দিদি বৌ তো ব্যাট ঘুরিয়ে দিল গো। দেখলে শাশুড়ীর হাল?

নোতুন মাসী নাকি অনেক দেখেছে। সে বলে—তাই দেখছি। লেখাপড়া জানা গাড়িওয়ালা অফিসার বৌ এখনও তো দেবে থোবে। শাশুড়ীকে কিনে নেবে, তবে টিকলে হয়? ছাকোনা এরপর না যোড়ে অফিসের সাজানো ফেলাটে গে ওঠেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিসী বলে—দেখা যাক। আজ উঠতে হবে বড় বৌ, তোমার শাশুড়ীতো ব্যস্ত। এতখানি পথ যেতে হবে।

সুতপা বলে—চা জলখাবার আপনারাও খেয়ে যান পিসীমা। চা আপনারা না খেলেও করতে হবে ওর জন্য।

সুতপাও চাপা বিরক্তিভরে ওই ইঙ্গিতটা করতে ছাড়ে না।

সন্ধ্যার পর অণিমার ঘরে আজ আড্ডা জমেছে। শিবু করবীও এসেছে। অনুতোষ তবু ধমকায়—এ্যাই, নো গোলমাল। আধ ঘণ্টার আড্ডা। ব্যাস তার পর যে যার কাজে বসবে।

শিবুও খুশি হয়েছে।

সুতপা এঘরে চা দিতে এসে দাঁড়ালো। শিবু বলে—বুঝলে বড় বৌদি 'মেজো যা শার্ট প্যান্ট-এর কাপড় এনেছে ফাইন। আর রিয়েলি বই দুটো পেয়ে খুব কাজ হয়েছে মেজো। এ বই বাজারে মেলেনা।'

অণিমা বলে—ওরা আমাদের ব্যাঙ্ক মারফত ফরেন থেকে বই আনান, তাই ফোন করে বলে দিতে ওরা দিয়েছেন।

করবী হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বসে। করবীও যেন তার মনের হারানো খুশিটাকে ফিরে পেয়েছে। এ বাড়ির স্তব্ধ পরিবেশে ওঠে গানের সুর, হাসির উচ্ছলতা।

সরসীবাবু চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে তিনি শেষ দিনে ডুবে থাকতে চান। ওই হাসি—গানের সুর কানে আসতে একটু বিস্মিত হন। এতকাল সন্ধ্যার পর এ বাড়িতে ছেলেদের পড়ার সুরই উঠতো। সেখানে কোন উচ্ছলতা কলরব ছিল না।

হঠাৎ সেই এত কালের নীরবতাকে এরা ছত্রখান করে দিয়েছে কি আঘাতে। সরসীবাবু চাইলেন স্ত্রীর দিকে।

সরমা কি সেলাই করছিল—স্বামীর দিকে চেয়ে বুঝতে পারে ব্যাপারটা। ওর চোখ মুখের বিরক্তি সরমার নজর এড়ায়নি। সরমা আজ যেন একটু বদলেছে।

বলে সরমা—সারাদিন খেটে খুটে ফিরে ওরা একটু গল্পগাছা করছে। করবীও গান টান শিখছে এখন। এরপর সব পড়তে বসবে। মেজ বৌমা নাকি বলছিল করবীর জন্য তার চেনা জানা এক দিদিমণিকে ঠিক করেছে। এই বুধবার থেকেই সে পড়াতে আসবে।

গানের সুর, ওই কলরবকে আজ যেন সরমাও সমর্থন করে। সেও বুঝেছে, দেখেছে অনেক বাড়িতে কাজের অবসরে সকলেই এমন এক আধটু করে থাকে।

সরসীবাবু বেশ বিরক্তি সহকারে সশব্দে ভারি বইটা বন্ধ করে চোখ থেকে চশমাটা খুলে জানলার বাইরে মিত্তির বাগানের পুরোনো দেওদার গাছটাকে দেখতে থাকেন, পাম—দেওদার আরও কি একটা গাছকে দেখেছিলেন তিনি ছোট থেকে, আজ মাত্র দুটো গাছ টিকে আছে। রাতের বাতাস ওদের পাতায় শব্দ বাজায়, আলো আঁধারি

ঢাকা নির্জন বাগানটায় অতীতের স্মৃতি যেন গুমরে ফেরে কি নিঃস্বতার সুরে। কোন প্রতিবাদ কোথাও কেউ করে নি। সব হারানোর বেদনাটাকে সয়ে নিয়েছে ওরা চুপ করেই।

ওই নিঃস্বতার মাঝেই যৌবন—আগামী দিন যেন জয়ধ্বনি দিয়ে তার শাসনকে কায়েম করতে চায়। অণিমাকেও গলা মেলাতে হয়েছে। শিবু বলে সুতপাকে—এ্যাই বড়ো—কাম এ্যাণ্ড জয়েন।

আর বাবা মায়ের ঠাকুর ঘরেও তো ব্রতকথা, পাঁচালী শোনাও. ধরো—

সুতপা দেখছে এদের। তাব মনে এগুলো ঠিক তৃপ্তি আনেনি। দেখেছে অণিমা যেন তাকে পিছনে ফেলে এ বাড়ির সব মানুষগুলোর মন জয় করে তার শাসন কায়েম করেছে। শাশুড়ীর মত কঠিন মানুষও ওকে সমীহ করে চলে।

আর সুতপাকে আজও দুবেলা অন্তঃপুরের পাঁচীলের মধ্যে বন্দী হয়ে মুখ বুজে শাশুড়ীর ধমক সয়ে এই সংসারের বোঝা বইতে হচ্ছে। তার স্বামীও তাকে দেখেনা ঠিক মত। অবহেলার কথাটা সুতপার নারীমনকে বিষিয়ে তুলেছে।

সুতপা সেই অভিযোগটা এখানে নয় যথা স্থানেই প্রকাশ করবে এবার। শুনেছে করবীর জন্য মাষ্টারণী আসছে। সব সুরাহাই হবে, মুক্তি পাবেনা সে। সবাই ছাড়িয়ে যাবে তাকে, এই সংসারের দাসী বৃত্তি করতে হবে সুতপাকেই।

শিবুর কথায় সুতপা রাগটা চেপে রেখে বলে।

—আমার ওসব করার সময় কই ভাই। ওদিকে উনুন—হেঁসেল এসব কে দেখবে, চলিয়ে।

সুতপা বের হয়ে গেল।

তবু অণিমার চোখে পড়েছে সুতপার মনের নীরব জ্বালাটা।

অণিমা ওদের হৈ চৈ থামিয়ে বলে।

—এ্যাই! দেরী হয়ে গেছে, শিবু পড়তে যাও। করবী বই

নিয়ে বসো দাদার কাছে। সামনের সপ্তাহ থেকে দিদিমণি আসবেন পড়াতে।

অনুতোষও ওদের আড্ডা ছেড়ে যে যার কাজে যেতে দেখে চাইল। শুধোয় সে—অণিমা, তুমি কোথায় চল্লে আবার?

হাসে অণিমা—যাই, বড়দির ওখানে।

কথাটা অণিমাই পাড়ে—ছাখো বাপু, ওকে কিছুটা রিলিফ দেবার কথা ভাবো। সংসারে এত লোকের দুবেলা হেঁসেল চালানো একার পক্ষে সম্ভব নয়! বড়দাকে বলো—

অনুতোষ কথাটা ভাবছে। তবু অণিমার মুখে এসব শুনে বলে —কি ব্যাপার বলো তো? তুমি কি রাতারাতি এ বাড়ির সবকিছু বদলে দিতে চাও? জানোতো আসল বামুন নাহলে বাবা-মা তাদের হেঁসেলেই ঢুকতে দেবে না। এবাজারে রান্নার বামুনদের অধিকাংশতো দু খানা সুতো পৈতা বলে গলায় ঝোলানো বামুন, শেষকালে জাত ফাত হারানোর দায়ে পড়বো!

অণিমা ওর কাছে এগিয়ে এসে বলে,

—মশাই আমিও তো বামুন নই!

হেসে ফেলে অনুতোষ—আজ্ঞে না, এখন আইন মতে তুমি অণিমা চ্যাটার্জি! খাঁটি বামুন, অর্থাৎ বামনী, বুঝলে!

—থাক। অণিমা বের হয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

সরমা ওকে দেখে চাইল, বলে সে—এসব পারবে মেজো?

অণিমা চাকী বেলুন নিয়ে বসে বলে—কেন পারবো না। রুটি বেলতে খুব পারি।

সুতপা তবু খুশি হয় না। বলে—মা দেখলে আবার আমাকেই না বকে।

—থামুন তো। অণিমা রুটি বেলতে থাকে।

তবু সুতপার রাগ যায় নি। তিল তিল করে কিছুদিন থেকেই রাগটা জমেছে। অণিমার তবু এগিয়ে এসে কাজ করার চেষ্টাকে

ভাল বলেই ধরে নিয়েছে। দেখেছে এ বাড়িতে তার সেই আসনটাও হারিয়ে গেছে। শিবু, করবী আগে তার কাছে দু চার টাকার জন্য ঝুলোবুলি করতো।

এখন তাদেরও টিকি দেখা যায় না।

ওরাও এড়িয়ে চলে বড় বৌদিকে। এখন সুতপার মনে জমেছে অনেক অনুযোগ।

প্রাণতোষ এবাড়িতে একটু চুপ চাপই থাকে। এতদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর পরীক্ষার পড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিল। অপিসের পরীক্ষাও চুকে গেছে। তবু সকাল সকালই শোয় সে।

সুতপার হেঁসেল সামলে সব পাট চুকিয়ে আসতে দেরী হয়। সুতপা আজ ঘরে ঢুকে প্রাণতোষকে পত্রিকাটা ওলটাতে দেখে চাইল। দরজা বন্ধ করে প্রাণতোষ এক-আধটা সিগ্রেট খায় এ সময় মৌজ করে।

কিন্তু আজ সুতপার অন্য মূর্তি দেখে একটু থতমত খেয়ে যায় সে। এতদিন সুতপা এ-বাড়ির বৌ হয়ে এসেছে, পাঁচজনের মতই। তার তরফ থেকে বড় জোর একটা শাড়ি এটা-সেটা ছাড়া কোন অভিযোগ ছিল না। আজ সেই শান্ত মেয়েটি যেন বদলে গেছে।

সুতপা বলে আজ—সংসারে সবই হচ্ছে। পড়াবার জন্য মাষ্টারণী আসছে,আর আমি একা এসব করতে পারবো না। হেঁসেল ঠ্যালার কাজ। ঠাকুর ফাকুর রাখবে তো রাখো নাহলে সামনের রবিবার থেকে মাস খানের জন্য বাবার ওখানে যাবো কৃষ্ণনগরে।

—সেকি! প্রাণতোষ স্ত্রীর দিকে চাইল, যেন নোতুন কথা শুনছে সে।

সুতপা শোনায়—আমার রক্তমাংসের শরীর, মেসিন নই। এসব দিনরাত ঠেলতে পারবো না। বুঝলে?

প্রাণতোষ-এর কাছে এটা এক নোতুন সমস্যা হয়ে ওঠে। সেও আজ স্ত্রীর কথা ভাবে। এবাড়ির অন্য বৌ-এর তুলনায় সুতপার

পরিশ্রম—তার অবদানও এ সংসারে কম নয়। কিন্তু দেখেছে মেজ-বৌমার দাম এবাড়িতে রাতারাতি বেড়ে গেছে।

সুতপার অনুযোগ-এর কারণটাও বোঝে সে। প্রাণতোষ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে—ঠিক আছে। আমি মাকে বলছি যা হয় একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

সুতপা আজ বেশ জেদের সঙ্গে জানায়।

—তাই করো, নাহলে আমিও জবাব দিচ্ছি, এই দাসী-গিরি করতে পারবো না। দরকার হয় বাবার ওখানেই চলে যাবো। তারা তাদের মেয়েকে ফেলতে পারবে না।

সরসীবাবু সেদিন সরমার সংসারে তাই নোতুন এক বামুন ঠাকুরকে দেখে একটু অবাক হয়। তবে লোকটি নিরীহ আর সাত্বিক ধরনের।

সুতপাই তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছে। সুতপা মনে মনে খুশী হয়েছে। তবু তার সময় কিছুটা মিলেছে। সরসীবাবু দেখছেন এ সংসারের এই বদলাবার পালাটা।

সরমাকে বলেন—খুবতো দেখছি চুটিয়ে সংসার চালাচ্ছো? রান্নার ঠাকুর, মেয়েকে পড়াবার জন্য মিসট্রেস। সংসারের খর্চা—ঠাঁট বাট বাড়ানো ভালো নয়. অনুর মা।

সরমার স্বপ্ন যেন সফল হতে চলেছে। এমনি একটি সংসারের ছবিই সে দেখেছিল। ছেলেরা দাঁড়াবে—এত দিনপর তাই হতে চলেছে। কাজের লোক—রান্নার লোক—পড়াবার জন্য মিসট্রেস সবই এসেছে। বাড়ির দরজায় দুবেলা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে।

দেখেছে সরমা এ পাড়ায় তাদের সেই দৈন্য দশা কেটে গিয়ে পূর্ণতার ভাব এসেছে এটা অনেকের নজরে পড়ছে। সরমাও মাঝে মাঝে গাড়িতে চড়ে বের হয়। স্বামীর কথায় সরমা বলে।

—তোমার ওই দোষ। ওদের সংসার ওরা যদি এখন এভাবে চালায় তাতে তোমার আমার কি বাপু; সংসার এবার ওদের বুঝে

নিতে দাও। নিজেরা ধম্ম কম্মো নিয়ে থাকি। হ্যাঁ—বৌমা গাড়ি বলে দিয়েছে। তৈরী হয়ে নাও, গুরুদেবের ওখানে যাবো।

সরসীবাবু ম্লান হাসি হেসে বলেন,

—আবার গাড়িতেও চড়তে হবে বলছো ?

সরমা জানায়—নাও। আদিখ্যেতা রাখো। ওঠোতো। সারাজীবন ধরে মাষ্টারি করে করে ওই স্বভাবটা গেল না। কোন কিছুকেই সোজা চোখে ছাখোনা।

সরসীবাবুর ভয় হয়। জানেন সংসারকে। এর নগ্ন অভাবের স্মৃতিটাকেই এতদিন দেখেছেন, তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন বাঁচার জন্য। সেখানে কোন দ্বিধা—ভয়—দৈন্য ছিল না মনে। মানুষ কিছু অযাচিত ভাবে পেলেই তার মনে হয় তার অন্তরে একটা ভয় জন্মে। লোভ আসে—সেই সহজ প্রাপ্যটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। তার জন্য হারাতে হয় তার বিবেক, মনুষত্বকে।

এই পাওয়ায় তাই তিনি খুশী হননি। সরমার জন্যও দুঃখ হয়, ও যেন বদলে ফেলেছে নিজেকে, সামান্য পাওয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এইটুকু হারাতে চায় না সে।

—ওঠো! সরমার কথায় কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গকে এড়াবার জন্য সরসীবাবু উঠলেন। নীচে গাড়ির হর্ণের শব্দ শোনা যায়। সরমা বলে।

—দেরী করো না। গাড়ি এসে গেছে।

সকাল থেকেই এ বাড়ির চাকাটা চালু হয়। সুতপা রান্নার লোককে এটা সেটা নির্দেশ দিচ্ছে। অণিমাও অভ্যাসমত নিচে এসে বসেছে কুটনো কুটতে।

হঠাৎ করবীর ডাকে চাইল!

হাসছে করবী। সরমা বলে—কি হ'ল রে ?

—ইয়া মোটকা একটা লোক এসে বলছে বাবাকে, মেমসাব্‌কো সাথ্‌ ভেট করেগা! ঝকঝকে গাড়ি থেকে নেমে এমনি করতে

করতে এল! মেজবৌদি—তুমি নাকি মেমসাহেব? ছাখো গে বাবা ডাকছেন তোমাকে।

অণিমা অবাক হয়। অফিসে ইদানীং মেমসাহেব বলে দু'চার জন, সেটা পছন্দ করেনা অণিমা। তার বাড়িতে কাকে আসতে দেখে অণিমা অবাক হয়! তবু অণিমা মাথায় কাপড়টা তুলে দিয়ে বলে।

—চলতো করবী!

সরসীবাবু সকালে বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, রাস্তায় গাড়িটা এসে থামতে শুনেছেন, খেয়াল করেন নি। হঠাৎ মোটামত এক শেঠজীকে দেখে চাইলেন। পিছনে একটা লোকের মাথায় বিরাট ভেটের ঝুড়ি। শাড়ির প্যাকেট, গাঙ্গুরামের সন্দেশের ইয়াবড় প্যাকেটের নীচে নোতুন ঝুড়িতে দেখা যায় সুপক্ক আম, আনারস, অসময়ের কমলালেবু, আরও কি সব উঁকি মারছে।

শেঠজীর দিকে চাইলেন তিনি। শেঠজী বলে।

—নমস্তে বাবুজী। থোড়া মেমসাব্‌কো সাথ্‌ ভেট করে গা।

—মেমসাহেব! সরসীবাবু জানান—মেমসাহেব এখানে কেউ থাকে না শেঠজী! আপনি ভুল করেছেন!

শেঠজীর বিরাট ভুঁড়ির উপর চকচকে ছোট মাথাটা নড়ে ওঠে, কপালে চন্দনের ফোটা। শেঠজী বলে।

—নেহি বাবুজী। এহি কোঠি। মুনিমজী পাক্কা খবর দিয়ে গেছে। মিসেস অণিমা চটোরজির কুঠি, এহি হ্যায়। হম বৈঠতে হ্যায়, থোড়া সেলাম দিজিয়ে।

সরসীবাবু একটু অবাক হন। বাইরের অপরিচিত কোন ভদ্রলোক এভাবে বাড়ি চড়াও হয়ে এ বাড়ির কোন বৌ-এর সঙ্গে দেখা করবে এটা ভাবতে পারেন নি। মনে হয় কঠিন স্বরেই ওকে বলবেন চলে যেতে। কি ভেবে রাগটা চেপে করবীকে ডেকেছেন খবর দিতে।

অণিমাকে ওই শাড়িপরা ঘরোয়া অবস্থায় দেখে টাকার কুমীর

শেঠজী একটু ঘাবড়ে গিয়ে চাইলেন। গোবদা দুহাত একত্রিত করে বলে—নমস্তে! হম রতনলাল আগরওয়াল জী! থোড়া কুছ—

ওই মূল্যবান ভেট-এর দিকে নির্দেশ করে। অণিমা চটে উঠেছে ওর এখানে এভাবে আসায়। ওর কেসটার ভার হাতেই রয়েছে।

লোকটা তাই তাকে খুশী করে কাজ হাসিল করার জন্য এসেছে। রতনলাল বলে—কেসটা রেকমণ্ড কর দিজিয়ে, কারখানা মেরা চালু হ্যায়। আউর বড়া করেগা—আপনি থোড়া মদৎ দিলে ব্যস—স্যাকস্‌ন হোয়ে যাবে। আর আপনার ভি কুছ

অণিমার কাছে এসব নোতুন ব্যাপার। শুনেছিল সে এমন কাণ্ড ঘটে থাকে। আজ তার এখানেই ওই আবেদন নিয়ে কাউকে আসতে দেখে অণিমা কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে বলে—শেঠজী, আমাকে মাপ করবেন, ইনস্‌পেকসন করে ব্যাঙ্ক যতটা দেওয়া উচিত ভাববে সেই টাকাটাই পাবেন। এনিয়ে আমার কাছে এসে লাভ নেই। দয়া করে ওসব উঠিয়ে নিয়ে চলে যান। নমস্কার।

রতনলাল অবাক হয়—মেমসাব বড়ো ভরসা করে ইসব আনলো—

--নিয়ে যান্! ওসব নিতে পারবো না।

অণিমা কথাগুলো বেশ জোরের সঙ্গে বলেই ভিতরে চলে গেল। শেঠজী খুশি হয় নি। তবু সরসীবাবুকে বলে।

—আপনি বলে দেন বাবুজী, এত গোস্‌সা হলে কারবারী মানুষ আমরা যাবো কোথায়?

সরসীবাবু বলেন—ওসব ব্যাপারে আমি কিছু বলিনা শেঠজী। শেঠ রতনলাল সঙ্গের লোকটাকে বলে শুকনো গলায়,

—লে চল গাড়িমে!

করবী কথাটা ভিতরে গিয়ে বলছে।

সরমা চুপ করে শোনে। সুতপাও। শিবু চায়ের কাপটা ধরে শুনছে। করবী বলে—লোকটা কতো কি এনেছিল মা। বেনারসী

শাড়ি সন্দেশ আল্‌ফানসো আম আনারস কলা। বৌদিতো ধমকে ধামকে তাকে বিদায় করলো।

সুরমা বলে—এসব কি বৌমা! লোকটা বাড়ি বয়ে ভক্তি ছেদ্দাকরে কিছু দিতে এলো তাকে কিনা তাড়ালে?

অণিমা অবাক হয়—মা! ওতো ঘুস! ছিঃ।

শিবু হেসে ওঠে—সাবাস মাদার! দারুণ চালু হয়ে গেছো তো? ঠিক করেছো বৌদি। ওই শয়তানগুলো ব্যাঙ্কের টাকা নেবে আর সেগুলো মেরে দেবার তাল করে লোকের সর্বস্ব শুষে নেবে। আমি হলে ওর পিছনে একটা লাথি কসে আউট করে দিতাম।

সরমা বলে—কে জানে বাপু, কি যে বলিস তোরা? ভদ্দর লোক এল—

শিবু গজগজ করে—ভদ্দর লোক! ওগুলো চোর ডাকাত! এ্যাই রে!

শিবু লাফ দিয়ে উঠে বলে—প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে ফ্যাক্টরী ট্রেণিং-এর। চলি মাদার। চলি মেজো! মিস্ত্রীগিরি করে আসি!

অফিসের বেলা হয়ে গেছে। এ বাড়ির চাকাও পুরোদমে চালু হয়ে যায়। প্রাণতোষ বের হয়েছে, এদেরও গাড়ি এসে যাবে। তৈরী হচ্ছে অণিমা।

সবিতা ক'দিন অপিস আসছে, চুপচাপই থাকে। টিফিনরুমে যায় নিবেদিতাদেরও এড়িয়ে চলে। লতিকা বলে।

—বেচারা! চুপচাপ হয়ে গেছে কেন?

হাসে নিবেদিতা—সোয়েটার টা এখনও বুনছে দেখছি। হরিপদ তো ছুটিতে!

রেবা বলে—ইডেনে যায়, না হয় বাড়িতে আসে শুনেছি। হাবা-গোবা ছেলেটা ওর ভয়েই বোধহয় ছুটি নিয়েছে রে!

সেদিন সবিতা টিফিনরুমে চুপকরে বসে আছে। ক'দিন হরিপদর দেখা নেই। মনটা কেমন করে। হঠাৎ এই মেয়েদের

টিফিনরুমে হরিপদকে ধুতি পাঞ্জাবী পরে বেশ হাসিমুখে ঢুকতে দেখে চাইল। হাতে ব্যাগ।

নিবেদিতা চাইল ওর দিকে। মনে হয় ও যেন সবিতাকে এখানে খুঁজতে এসেছে। ওরাও বিস্মিত হয়েছে হরিপদর ব্যবহারে।

সবিতা খুশী হয়। ওর মুখে হাসির ছটা। দেখছে হরিপদকে। এগিয়ে আসছে সে এদের সামনে দিয়ে ওকোণের টেবিল থেকে। কিন্তু থমকে দাঁড়ালো সবিতা। তার পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। হরিপদ তার দিকে ফিরেও চাইল না। বেশ বুঝেছে সবিতা হরিপদ তার কাছে আসেনি। তাকে যে কিছুমাত্র চেনে এটুকুও দেখালো না। সবিতা ওপাশের টেবিলের ধারে কাঠের মত দাঁড়িয়ে গেছে।

হরিপদ ব্যাগ থেকে লাল হলুদ প্রজাপতি মার্কা কার্ড বের করে বলে—নিভুদি, লতিকা দি আমার বিয়ে, তাই নেমন্তন্ন করতে এলাম। রেবাদি—কার্ড দিয়ে গেলাম। বৌবাজার ছিদারাম ব্যানার্জি লেন, বেশী দূর নয়, অপিস থেকে আপনারা সব বৌভাতের দিন যাবেন কিন্তু!

নিবেদিতা বলে—কোথায় বিয়ে হচ্ছে?

—শ্রীরামপুরে। বাবার বন্ধুর মেয়ে নাকি। বাবাই সব ঠিক করে একেবারে হুকুম করলেন—বিয়ে করতে হবে।

হরিপদ অসহায়ভাবে জানায়—বাবার কথা ফেলি কি করে বলুন? গুরুজন। তাহলে আসছেন আপনারা। কেমন? চলি। অনেক নেমন্তন্ন করতে বাকী আছে।

হরিপদ জামায় এখন থেকেই সেন্ট ছড়িয়েছে। সেই সুরভির একটু ক্ষীণ আবেশ রেখে চলে গেল। নিবেদিতা দেখছে ওকোণে সবিতাকে। বলে ওঠে নিবেদিতা রেবাকে— একে একে নিভিছে দেউটি।

সবিতা এতক্ষণ ধরে দেখছিল হরিপদকে। ওকে নেমন্তন্ন করার ভদ্রতাটুকুও দেখায় নি। তার স্বপ্নও ব্যর্থ হয়ে গেল, হাতে ধরা

রয়েছে ওর জন্য আধবোনা সোয়েটারটা। কি জ্বালায় সারা মন জ্বলে ওঠে। সবিতা রাগের বশে ওই খানেই আধবোনা সোয়েটারটা দুহাতে পাগলের মত টেনে উলগুলোকে ছত্রাকার করে খুলে একটা চেয়ারে আছড়ে পড়ে ঘৃণায় রাগে অপমানের আঘাতে দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে। রেবা চাপাস্বরে বলে।

—ব্যাটার বয়সী একটা ছেলেকে নিয়ে ধ্যাষ্টামো!

—রেবা! হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল রেবা।

অণিমা এসে কখন ঢুকেছে তা ওরা দেখেনি। অণিমা দেখেছে ব্যাপারটা। ওদের হাসি ব্যঙ্গ থামিয়ে সে এগিয়ে যায় সবিতার দিকে।

—এ্যাই। সবিতা।

সবিতা অসহায় ভাবে তখন ফুপিঁয়ে কাঁদছে। অণিমা ওর পিঠে হাত দিয়ে ওকে ডাকছে। বলে সে—চলো আমার চেম্বারে।

তার ঘরে এনে বসিয়েছে সবিতাকে। সবিতাও সামলে নিয়েছে নিজেকে। এটা তার নিছক ছেলেমানুষিই সেটা বুঝেই লজ্জা পায়। একটা বিশ্রী ব্যাপার করে ফেলেছে সে।

অণিমা বলে—নিজেকে এভাবে ওদের সামনে খেলো করো কেন? ওদের থেকে কাজের মেয়ে তুমি।

সবিতা নিজের শূন্যতার জ্বালাটাকে বুঝতে পারেনা, সেই জ্বালার বশেই যেন বারবার ভুল করে এসেছে।

—নাও। কফি খাও।

বুড়ো মহেশ বেয়ারা কফি এনেছে। অণিমা বলে।

—আজ বাড়ি চলে যাও। কাল থেকে আমার সেকশনে এসে কাজ করবে, ওই বড় হল ঘরে বসতে হবে না।

সবিতা ওর দিকে চাইল। এখানের নিরালায় সে ভালো থাকবে, ওদের মাঝে কাজ করতে বসে অনেক টুকরো তীক্ষ্ণ মন্তব্যও শুনতে হয়। এখানে ভালোই থাকবে সে অণিমার সেকশনে।

সবিতা বলে—ঠিক আছে।

মনেমনে সবিতা আজ অণিমার কাছে কৃতজ্ঞ। সেইই তাকে একটা লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে নিজের আশ্রয়ে এনেছে। মনে হয় সবিতা যেন একজনকে পেয়েছে যার কাছে নিজেকে সে প্রকাশ করতে পারে।

মনোহর মুখুয্যে সেদিন প্রথম অণিমাকে দেখে একটু আশাই পেয়েছিল। ওদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে মনোহর বাবুর কারবার অনেক দিনের। আর সেই ব্যবসার পথটা ঠিক সোজা নয় এটা পরে বুঝেছে অণিমা। তাই এরপরও মনোহরবাবু সরসীবাবুর কাছে দু একবার এসেছেন, ভেবেছিলেন অণিমা এসে কথাবার্তা বলবে, মনোহর বাবু কিন্তু লক্ষ্য করেছে অণিমা এসে দু'একটা কথা বলেই সরে গেছে।

মনেমনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনোহর। সরসীও বলে—আজকালকার মেয়েরা এমনি। বুঝলে মনোহর গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে যেন ওরা চায় না। দু দণ্ড কথা বলবে তাও জানে না।

মনোহর হাসবার চেষ্টা করে।

মনোহর বলে—আরে যেতে দাও সরসীদা, আমরা হলাম সকেলে মানুষ, কি কথা ওরা বলবে বলো? তারপর অফিসার হয়েছে একটু কমসম কথা বলাই ভালো।

সরসীবাবু খুশি হন না।

মনোহরকে যে বৌমা এড়িয়ে যায় এটা বুঝেছেন তিনি। মনোহর বলে।

—এখনতো গাড়ি ফোন পেয়েছে অফিস থেকে। ভালোই আছো।

সরসীবাবু এড়াবার চেষ্টা করেন। মনোহরবাবু বোধ হয় এবার টাকার তাগিদ দেবে। ক'বছর হয়ে গেল বেশ কিছু টাকা নিতে হয়েছিল ওঁর কাছে। অবশ্য শুধু হাতে নেন নি সরসীবাবু এই বাড়িই দলিল রেখেছিলেন। এবার সেটা যেন প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

সরসীবাবু বলেন—তোমার টাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে মনোহর।

মনোহরবাবু বলেন—এত ভাবছো কেন। শিবুর চাকরী হোক না। মনোহরও যেন নিজের স্বার্থেই সেই টাকার তাগিদ দিতে চায় না।

মনোহরবাবু বলেন—আজ চলি।

—এসো। সরসীবাবু ওকে এগিয়ে দিতে যান নীচে।

সেদিন সকালে অফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে অণিমা। অনুতোষ খেতে বসেছে, সেইই তাড়া দেয়—এসো অণিমা, দেরী হয়ে গেল খাবার দিয়েছে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে এসেছে অণিমা। অফিসেও জরুরী কাজ আছে। একটু আগে পৌঁছতে হবে, মিঃ বোস-এর সঙ্গে জরুরী মিটিং আছে। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে বাইরের ঘরে।

সরসীবাবু ধরেছেন—কে? মনোহর?

মনোহরের কথার স্বরে একটু বিব্রত ভাব। মনোহর বলে।

—হ্যাঁ। বৌমাকে একটু দাও না।

সরসীও অবাক হয়—বৌমাকে দরকার। কেন? ও অফিসের ব্যাপার বুঝি? দিচ্ছি। করবী—বৌমাকে ডেকে দে। ফোনে মনোহর কাকা ডাকছে।

সরসীবাবুও জানেন ওদের ব্যাঙ্কেই মনোহরের কাজ হয়।

অণিমা মনোহরের নাম শুনে একটু গুম হয়ে থাকে।

এড়াবার চেষ্টা করে সে। বলে অণিমা—বাবাকে বলে দে করবি আমি অফিস থেকে ওকে ফোন করবো।

সরসীবাবু অবাক হন—সে কি! ফোন ধরে রয়েছে। কি বলো? কি ভাববেন।

সরমাও দেখছে ব্যাপারটা। বলে সে।

—যাও না বাছা। ডাকছেন উনি।

টেবিলে খাবার পড়ে রইল। অণিমা ফোন ধরতে যায়।

মনোহরবাবু জেনে শুনেই ফোনে ডেকেছেন ওকে। অণিমা ফোনটা ধরেছে। বেশ বিরক্তি ভাব ফুটে ওঠে মুখে। মনোহরবাবু কি বলতে চান।

অণিমা বিব্রতভাবে বলে—দেখুন ওসব কথা ফোনে হবে না। তাছাড়া অপিসে বের হচ্ছি, এখন সময় নেই।

তবু মনোহরবাবু এবাড়ির বন্ধুই নয় যেন কর্তৃত্ব করার দাবী আছে এই ভাবেই কথাটা জানান—আহা শোনই না। যা করেছো সেটা কি ঠিক হয়েছে?

যেন কৈফিয়ৎ চাইছেন অণিমার কাছে।

অণিমা ওকে এড়াবার জন্যই বলে—এনিয়ে পরে কথা বলবো।

—আমার জবাবটা কিন্তু পাইনি।

মনোহর বেশ একটু চড়াস্বরেই কথাটা বলে। অণিমা কি জবাব দেবে জানেনা। মনে মনে যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করলেও সে-প্রসঙ্গ চেপে রেখে বলে।

—দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনি পরে কথা বলবেন। ছাড়ছি।

মনোহর একটু কঠিন স্বরে বলে—আমার কথাটা শোন—

কিন্তু অণিমা ফোনটা নামিয়ে দিল তক্ষুনিই। অণিমার মুখ-চোখের কাঠিন্য সরসীবাবুর নজর এড়ায়নি। তাছাড়া অণিমা তাকে যে কথা বলেছে সেটাকে বিনীত, এ বাড়ির বৌ-এর যোগ্য নম্র তা বলা চলে না। বেশ একটু চড়া স্বরে অনিচ্ছার সঙ্গে কথা বলেছে সে ওই মনোহরের সঙ্গে আর ইচ্ছে করেই তার কথা না শুনে, তার প্রশ্নের জবাব না দিয়েই দুর্বিনীত ভঙ্গীতে ফোনটা নামিয়ে দিয়েছে।

সরসীবাবুর কাছে ওর এই ঔদ্ধত্য ভালো লাগেনি।

বলে ওঠে সরসীবাবু—একটু দাঁড়াও বৌমা।

অণিমা দাঁড়ালো ওর কথায়। সরসীবাবু এগিয়ে এসে বলেন।

—ব্যাপারটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানেই শুনেছি। তাই বলছি বৌমা—মনোহর এ বাড়ির—এই পরিবারের

পুরোনো বন্ধু। আমার প্রিয়জন, তার সঙ্গে এমনি রূঢ়ভাবে কথা না বল্লেই পারতে। ফোনটা কেটে দেওয়াও তোমার ঠিক হয়নি।

অণিমা কি বলার চেষ্টা করে।

ঘড়িতে নটা বেজে গেছে। নীচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। তার হর্ণ শোনা যায়। অনুতোষও তৈরী হয়ে ডাকছে তাকে।

অণিমার খাওয়াও হয়নি। ন'টায় মিটিং।

—আমার কথারও জবাব দাওনি বৌমা। সরসীবাবু বলে ওঠেন।

সরমা-সুতপাও এসে পড়েছে দরজার কাছে সরসীবাবুর মত নীরব লোককে গরম হতে দেখে। অনিমা বলে।

—এ ব্যাপারের আপনি সব কিছু জানেন না বাবা, ওর সঙ্গে আমি পরে কথা বলবো। আজ দেরী হয়ে গেছে অপিসের। আমি চলি।

অবাক হয় সরমা, তবু বলে—খেয়ে যাবে না?

অণিমার ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। অণিমা বলে।

—খাবার সময় হবে না মা। মিটিং আছে জরুরী। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। আমি অফিসে খেয়ে নেব। চলো—

অনুতোষকে নিয়ে বের হয়ে গেল অণিমা।

সরমা দেখেছে অণিমার খাবার পড়ে আছে। না খেয়েই চলে গেল। তার রাগটা পড়ে ওই সরসীবাবুর উপরই। সরমা বলে।

—না খেয়ে গেল মেয়েটা, কি বলেছিলে ওকে?

সরসীবাবু জানান—তাকে কিছুই বলিনি বড় বৌ। তোমার বউমাই অভদ্রের মত মনোহরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ না করে লাইনটা কেটে দিল। তাই বলছিলাম এটা ঠিক করেনি।

শিবুও ব্যাপারটা শুনে বলে।

—অপিসের কথা কাকাবাবু অপিসে বললেই পারতেন!

সরমা চুপ করে থাকে। সরসীবাবু বলেন—সেইটাই ওর ভুল হয়েছিল। এখন চুপ করো তোমরা।

তবু বাড়ির আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে ওঠে !

সরমা পূজার আয়োজন করছে। সুতপা রান্নার শেষ পর্ব নিয়ে ব্যস্ত। রান্নার ঠাকুরকে পোস্ত বাটার পরিমাণ দেখাচ্ছে। এমন সময় মনোহর বাবুর গলা পেয়ে একটু অবাক হয়।

সরসীবাবুর ঘরে বসেই মনোহর কাকার সেই হাসির শব্দ শোনা যায়। যেন কিছুই হয় নি। মনোহরবাবু অবশ্য ফোনের লাইন কেটে যেতে ভেবেছেন ফোনই খারাপ, তাই নিজেই এসেছেন।

—বৌমা কই গো সরসীদা ?

সরসীবাবু তখনও বেশ গম্ভীর। সরমা বলে।

—কি হয়েছিল ঠাকুরপো ? লাইনটা কেটে যেতে উনিতো বৌমাকে বেশ কড়া করে কি সব বললেন ! গুরুজনকে মান্য করে কথা বলো।

—তাই নাকি ! মনোহর অবাক হবার ভান করে বলে।

—এই কাণ্ড ! ছিঃ ছিঃ ! না সরসী দা তোমার স্বভাব বদলালো না। টেলিফোনে কথা বলার এখন কিছু ঠিক আছে ? এই যায় তো লাইন এই আসে। ছাখো দিকি তুমি আবার বৌমাকে কি সব বল্লে ? আর ওরা ছেলেমানুষ, ওদের কথা ধরতে আছে ? না—আমাকেই দেখছি ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তা অফিসে গেছে বুঝি ? ওদিকেই যাচ্ছি—ওখানেই কথা বলে যাবো।

সরসীবাবু কিছুটা হাল্‌কা বোধ করলেও ঠিক মনের রাগটা কমে না তাঁর। অণিমার মুখচোখে কি কাঠিন্য তিনি দেখেছিলেন। তাই বলেন—না, না। এসব ভালো কথা নয় মনোহর। এর প্রতিবাদ করা উচিৎ।

মনোহর উঠছে। তাকে একটু বিব্রতই বোধ হয়। সরমা বলে—এখুনই উঠবেন ?

—হ্যাঁ। জরুরী কাজ আছে, দুদণ্ড বসে যে কথা কইব তার সময় কই ! চলি সরসীদা।

মনোহর উঠে চলে যাচ্ছে, সরসীবাবু দেখছেন ওকে। ব্যাগটা ফেলে রেখেই চলেছে মনোহর। সরসী বাবু বলেন—ওহে, তোমার ব্যাগটা!

—ও—হ্যাঁ! মনোহরবাবু ফিরে এসে ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে গেল।

সরসীবাবুর কাছে মনোহরের মুখ চোখের অন্যমনস্ক ভাবটা ধরা পড়েছে, বলেন তিনি।

—কি ব্যাপার বলোতো? মনোহরেরও ভুল হচ্ছে?

সরমা বলে—যা কাজের চাপ ওর, তাতে বেচারা মাথার ঠিক রেখে চলেছে এই ঢের। তুমি হলে তো হৈ হৈ বাধাতে।

সরসীবাবু বলেন—ওর মতো টাকার পিছনে ছুটতে চাইনি কোনদিন। তবুও শান্তি কই বড়বৌ! ওসব ভাগ্য। আজকের মানুষ অনেক কিছুই পাবে কিন্তু ওইটিই থাকবে না আর।

সরমা সরে গেল। জানে ওর লেকচার শুরু হলে আর থামবে না।

মিঃ বোস—অভিজিৎ—মিঃ শেঠী—মিঃ সেন অনেকেই রয়েছেন, অণিমা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে অপরাধীর মত বলে—সরি। আই অ্যাম লেট স্যার।

মিঃ বোস ওর দিকে চাইলেন। ফাইল থেকে রিপোর্টটা পড়ে চলেছে অভিজিৎ। ওদের লোন রিয়েলিজেশন ড্রাইভ-এর বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পড়ার পর মিঃ বোস মন্তব্য করেন।

—এ গুড প্রগ্রেস। অণিমা—তোমার সেকশনের কাজও ভালো চলছে। তবে ইউ মাষ্ট কিপ্ দিস ভিজিল্যান্ট ওয়াচ। আর যাদের এগেনষ্টে আমরা লিগ্যাল নোটিশ দিয়েছি সেই পার্টিদের কোনরকম দরখাস্তও এনটারটেইন করবো না যতক্ষণ না তারা একটা রিজনবেল এম্যাউন্ট পে করে। আদারওয়াইজ লেট দেম গো টু দি কোর্ট টু আন্সার। আমরা যে স্টেপ নিয়েছি তাই নেব।

অভিজিৎ দেখছে অণিমাকে।

ওকে যেন ক্লান্ত দেখায়। মিঃ বোস শুধোন।

—কিছু বলবে অণিমা? এনি সাজেশন?

—না স্যার।

—দেন ফলো দিস গাইড লাইন। মনে হয় এতে কাজ হবে। আমরা ডিজঅনেষ্ট কিছু ব্যবসায়ীকে শিক্ষা দিতে চাই, বাট অলয়েজ সাপোর্ট দি কারেক্ট ম্যান। থ্যাঙ্ক ইউ অল।

মিটিং থেকে বের হয়ে এল অণিমা।

অভিজিৎ আর সে দোতলার করিডরে আসছে। অভিজিৎ বলে।

—শরীর খারাপ মিসেস চ্যাটার্জি? ফিলিং আন্‌ইজি?

অণিমা বিব্রত ভাবে জবাব দেয়—না! তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে হল।

আসল প্রশ্নটা সে তুলতে পারে না। শ্বশুরমশায়ের ওই ব্যবহারটাও বিচিত্র ঠেকে তার কাছে। অণিমা আরও বিস্মিত হয়েছে মনোহরবাবুর ব্যবহারে, লোকটার ফাইলগুলো সবই তন্ন তন্ন করে দেখেছে, বেশ বুঝেছে যে মনোহরবাবু উপরে যে ভালোমানুষি দেখান ভিতরে ঠিক তার বিপরীত। একটি ভদ্রবেশী শয়তান!

ইনস্‌পেকশন রিপোর্টেও তার নানা কারবার-এর কথা বলা হয়েছে। বেশ কয়েকটা কোম্পানীর নামে দফায় দফায় টাকা লোন নিয়েছেন, বেশ কয়েক লাখ টাকা। সে কোম্পানীকে সিক্ দেখিয়ে অন্য নামে অন্যত্র কারখানা খুলছেন, আর এইসব হিসেবের টাকা বিশেষ কিছুই ফেরৎ দেননি নানা অজুহাতে।

মনোহরবাবু যে এমনি অবস্থা করে রেখেছেন এটা জানা অবধি অণিমা অস্বস্তি বোধ করছে। অফিস থেকে ওদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকে মহেশকে জল দিতে বলে চেয়ারে চোখবুজে বসেছে অণিমা। হঠাৎ দরজা ঠেলে ভিতরে স্বয়ং মনোহরবাবুকে আসতে দেখে চমকে ওঠে অণিমা।

—আপনি!

মনোহরবাবু নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু বলার আগেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে যুৎ করে বসে বলে ওঠে—এলাম বৌমা। সরসীর কথায় কিছু মনে করোনা। ও অমনিই। আর আমিও কিছু মনে করিনি। অফিসের তাড়া—তখন ফোন করাই ভুল হয়েছিল। এসে বললেই সব ব্যবস্থা হতো, আর মিছেমিছি বাড়িতে অশান্তি হতো না।

অণিমার গলা শুকিয়ে আসছিল, জলটা খেয়ে বলে।

—চা খান। মহেশ আমাদের একটু চা দিও।

—আবার চা কেন বৌমা? ঠিক আছে, বলছো—আনুক!

মনোহর যেন চা খেয়ে ওকেই কৃতার্থ করতে চায়। মহেশ বের হয়ে যেতে মনোহর এবার চেয়ারটা টেনে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে।

—তোমার কাছে এলাম বৌমা। এসব চিঠিপত্রর কেন যায় তুমি থাকতে?

এমনি প্রসঙ্গই উঠবে তা জানতো অণিমা। আগে থেকেই সে তৈরী হয়েছিল। তাই মনোহরের হাতে চিঠিগুলো দেখে বলে।

—এ ছাড়া উপায় কি বলুন? ব্যাঙ্ক কতদিন এতো টাকা ফেলে রাখবে? পাবলিক মানি।

হাসে মনোহর। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার জন্যই বলে।

—আরে এ তো আকছারই হচ্ছে? টাকা তো দেব না বলিনি; দেব। তবে এখুনিই একটু অসুবিধা রয়েছে, হাজার পাঁচ দশ দিচ্ছি। তুমি একটু বলেকয়ে ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করো বউমা। করতেই হবে।

অণিমা বলে—আমার করার কিছুই নেই। বোর্ড মিটিং-এ আপনার কেস নিয়ে আলোচনার পর ওই চিঠি দেওয়া হয়েছে।

মনোহর চাপাস্বরে বলে—হোক না! বড় সাহেবতো তোমার আপনজন। একটু থামিয়ে রাখো, ধরো ছ মাসটেক। অবশ্য তার

জন্য ধরো তুমিও কিছু পাবে। পাঁচ হাজার টাকা দেব আমি। কেউ জানবে না।

অণিমা দেখছে মনোহরবাবুকে। ওরা টাকার লোভ দেখিয়ে এইভাবেই সর্বত্রই সবরকম সুবিধা আদায় করে এসেছে অন্যায় ভাবে। আজ অণিমার সব কর্মনিষ্ঠা—সাধুতা—ব্যাঙ্কের প্রতি সততা-বিশ্বাস সবকিছু যেন ওই লোকটা পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নিতে চায়। ওর সবকিছুর দাম ওই মনোহরবাবুর নজরে মাত্র পাঁচহাজার টাকা।

ওকে চুপকরে থাকতে দেখে মনোহর বলে।

—ও আর কাউকেও দিতে হবে কিছু? ঠিক আছে—আরও দু' হাজার দেব। এখন আড়াই নাও। বাকিটা পরশু দিন দেব বৌমা।

অণিমা ওকে টাকা বের করতে দেখে এবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

—আপনি ভেবেছেন কি?

মনোহর অবাক হবার ভান করে—কেন বৌমা! সবাই নেয়—তাই তোমাকেও দিচ্ছি! তার বদলে তুমি আমার দিকটা দেখবে, ব্যাস! এতো নোতুন কিছু নয় বৌমা। নাও—

অণিমা চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। বেশ চাপা কঠিন স্বরে বলে।

—বৌমা বলে ডাকবেন না

মনোহর ওর দিকে চেয়ে থাকে। তবু বলে সে—অনেক বেশী চাইছ, ঠিক আছে, আরও হাজার খানেক দেব।

অণিমা এবার গর্জে ওঠে—দয়া করে ওসব তুলে নিয়ে আপনি চলে যান। শুনে রাখুন, ওই নোংরাপথে চিরকাল কাজ করা যায় না। যা জানাবার কোর্টে গিয়ে জানাবেন। যান্—যান্ এখান থেকে।

মনোহর-এর গোল মুখখানা তামাটে হয়ে ওঠে।

দু'চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। রাগটাকে সামালে নিয়ে দেখছে সে অণিমাকে! বুঝেছে মনোহর এখানে কাজ হবে না এভাবে বিপদই ঘনিয়ে আসছে তার ব্যবসার জগতে।

মনোহর টাকাটা ব্যাগে তুলে নিয়ে বেশ শান্ত গলায় বলে।

—কাজটা ভালো করলেন না মিসেস চ্যাটার্জি! সততা—আদর্শ! ওর কথায় তীব্র জ্বালা ফুটে ওঠে। অণিমা বলে—যান আপনি।

—যাচ্ছি। চলি মিসেস চ্যাটার্জি।

মনোহর উঠেছে। মহেশ চা নিয়ে ঢুকছে। মনোহর চা-টা দেখল মাত্র, তারপরই বের হয়ে গেল। অণিমা দুহাতে মাথাটা ধরে বসে আছে চোখ বুজে।

—চা দিদিমণি, উনি চলে গেলেন!

অণিমার খেয়াল হয়। বলে সে—উনি খাবেন না মহেশ। এক গ্লাস জল দাও।

মহেশ জল এগিয়ে দিয়ে ওর ঝড়ো চেহারার দিকে চেয়ে শুধোয়।

—শরীর খারাপ নাকি দিদি?

অণিমা হাসল। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। বলে সে—না। ও কিছু না।

ফাইল টেনে মনটাকে অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে অণিমা।

এক ধরনের মানুষ আছে যারা যে কাজই করেন হিসেব করে আটঘাট বেঁধে করেন। ফলে তাদের পথগুলো নানা দিকে ছড়ানো থাকলেও মজবুত বাঁধুনি থাকে সবকিছুতেই। বাইরে খোলা-মেলা দরদী সেজে ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে মাথা বাড়িয়ে দেন, চোট খেলেই নিমেষের মধ্যে তাদের সব মুখোস খুলে ভেতরের আসল সত্ত্বাটা বের হয়ে আসে নির্মম নৃশংস রূপ নিয়ে। চোট খাওয়া সাপের মত তখন এদের অবস্থা। নিজে বাঁচবার জন্য সবকিছু পথই নিতে এদের বাধেনা।

মনোহর বাবু সেই ধরনের মানুষ।

আজ তার নিজের হাতে গড়া ওই অন্ধকার সাম্রাজ্যের ভিতে ঘা দিতে চেয়েছে অণিমা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়েছে, তারা নোটিশ করেছে টাকা জমা দেবার জন্য, নাহলে কারখানা—গুদাম সবই

সিজ করাবে। মায় বসত বাড়ি অবধি। আর গ্যারাণ্টারদেরও নোটিশ করা হয়েছে। এককথায় সর্বস্বান্ত করে দেবার চক্রান্ত করেছে ওই মহিলাই।

মনোহরও তৈরী হয়েছে ছোবল দেবার জন্য।

সরসীবাবু সরমা সুতপা সকলেই অবাক হয় বৈকালেই মনোহর বাবুকে আসতে দেখে। মনোহরের মুখচোখ গম্ভীর থমথমে।

সরসীবাবু অবাক হন—তুমি এসময় : কি ব্যাপার মনোহর ?

মনোহরবাবু বলে—এলাম সরসীদা, ব্যাপারটার একটা ফয়সলা করার জন্যই আসতে হল।

—কি ব্যাপার ?

সরসীবাবু যেন কি সর্বনাশের ছায়া দেখেছেন। আজ সেই পুরোনো ইতিহাসটাই তুলে ধরেন মনোহরবাবু।

—সেদিন নিজের কারবারের ক্ষতি করেও তোমাদের বিপদে সাহায্য করেছিলাম সরসীদা। এতগুলো টাকা আটকে আছে, এবার তোমার ওই বৌমাই এই সর্বনাশ করেছেন। ব্যাঙ্ককে আমার বাকী টাকার সুদ সমেত হিসেব দিয়ে কোর্টের শমন ধরিয়েছেন।

সরসীবাবু চমকে ওঠেন—বলো কি ?

—সেই কথাই বলতে গেছলাম ফোন কেটে দিল, অফিসে গেলাম। বললাম, কিছুদিনের সময় করে দাও। টাকা দিয়ে দেব, এসব কোর্টঘর করা কেন বৌমা, তা আমাকে বলেন, বৌমা বলে ডাকবেন না। অপমান করেই বিদায় করলেন।

সরসীবাবুর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। বলেন তিনি।

—ছিঃ ছিঃ এসব কথা বলতে পারলো ? শোন অমুর মা—তোমার অফিসার বৌ-এর মেজাজ ছাখো। সেদিনও একজনকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল। ও ভেবেছে কি ?

মনোহরবাবু এইবার আসল ঘা-টা মেরে বলে।

—ওসব কথা যেতে দাও সরসীদা, তাতে আর আমার রক্ষে

হবে না। আমাকে যেভাবে হোক পনোরো দিনের মধ্যে টাকার যোগাড় করে জমা দিতেই হবে। তাই বলছিলাম, তোমাদের টাকাটা এতদিন চাইনি এবার দিতেই হবে।

সরসীবাবুর যেন পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। অসহায় কণ্ঠে বলেন।

—কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবো এখন ?

মনোহর এখন নির্মম হয়ে উঠেছে।

বলে সে—সেটা কি করে বলবো ? তবে না পারো আমি খদ্দের দেখছি, এবাড়ি বিক্রী করে দিয়েই টাকাটা আমায় দাও। বন্ধকী দলিলের ব্যাপারটাতো জানো। বলো যোগ্য ছেলেদের, তোমার অফিসার বৌমাকে। টাকা আমার চাই।

প্রাণতোষ অফিস থেকে ফিরছে। বাবার ঘরে মনোহরবাবুর গলা শুনে ঢুকেছে, সেও থমকে দাঁড়ায়। এমনি সর্বনাশা কাণ্ড হবে তা ভাবতেই পারেনি সে।

মনোহরবাবু প্রাণতোষকে দেখে বলেন—

তুমিও তো সবই শুনলে বাবাজী, দলিলের কথা তুমিও জানো। এবার তাহলে টাকার ব্যবস্থা করো, না হয় বাড়িই বেচে দাও। মোটকথা টাকা আমার চাই। আমি পরে না হয় আসবো, কাল পরশু কি ঠিক করলে জানাবে।

এসব নিয়ে কোর্টঘর হোক এ আমি চাইনা সরসী দা।

সরসীবাবু পাথরের মূর্তির মতন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখের সামনে সেই সর্বনাশের কালো ছায়াটা ঘনিয়ে আসে এ বাড়ির জীবনে।

শিবুও বাড়ি ফিরে সব কথা শুনে অবাক হয়। বলে সে।

—মনোহরকাকা এতদিন টাকার কথা বলেনি কেন ? চট্ করে আজ দখল দেখায় ?

প্রাণতোষ বলে—সেই সর্বনাশ করেছেন তোমার মেজবৌদি !

শিবু অবাক হয়ে শুধোয়—তিনি কি করলেন ?

নীচে গাড়ি আসার শব্দ শোনা যায়। গাড়ি থেকে নেমে আসছে অনুতোষ আর অণিমা।

অণিমা সারাবাড়ির থমথমে পরিবেশ দেখে একটু অবাক হয়। অনুতোষের চোখে এটা ধরা পড়ে। তাই বলে সে—কি ব্যাপার!

প্রাণতোষই ডাকছে ওদের—একটু ওপরে আয় অনু, বৌমাকেও আসতে বল। অণিমা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, তবু উঠে গেল শ্বশুরের ঘরে।

সারা পরিবারের জরুরী মিটিং বসেছে। ওদের দেখে চাইলেন সরসীবাবু।

সরমা শুধোয়—আফিসে কি হয়েছিল বৌমা মনোহর ঠাকুর-পোর সঙ্গে। ওতো বাড়ি এসে রীতিমত শাসিয়ে গেল বাছা। আর তুমি জানোনা তোমার শ্বশুর বড় মেয়ের বিয়ের সময় আর তার আগেকার কিছু দেনা মিটোতে ওর কাছে অনেক টাকা নিয়েছিলেন এ বাড়ি বন্ধক রেখে। সুদে মূলে অনেক হয়ে গেছে। তোমার অফিস থেকে কি সব কড়া চিঠি পেয়ে গেছল তোমার কাছে তুমিও তাকে নাকি যা তা বলেছো?

সরসীবাবু এবার স্ত্রীর কথার খেই ধরে বলেন।

—পনেরো দিনের মধ্যে আমাদের সব বাকী টাকা ওকে দিতে হবে, নইলে এ বাড়ি বিক্রী করে চলে যেতে হবে।

অবাক হয় অণিমা। এ বাড়ির সঙ্গে মনোহরবাবুর এই সম্পর্কের কথাটা সে জানতো না। এবার জেনে চমকে উঠছে সে!

তবু অণিমা বলে—মনোহর বাবু সাজ্ঘাতিক লোক মা। ওর ব্যবসাপত্রে বহু গলদ আছে। সোজা পথে তিনি চলেন না, আপনাদেরও এই ভাবে বিপদে ফেলার জন্য সে এসব করিয়ে রেখেছিল।

প্রাণতোষ সোজা হিসেবে চলে। আজ সেও মুখর হয়ে ওঠে।

—যে যা করছে করুক। কিন্তু এখন এবাড়ি বাঁচানোর কি হবে?

তখনতো অফিসারী মেজাজ দেখিয়ে ওকে বিগড়ে দিলে, একটা কিছু করতে তো হবে।

সরমা বলে—একটু তোমাদের বড় সাহেবকে বলো বাছা।

অণিমা জানে মিঃ বোসকে একথা বলা অসম্ভব। তাই বলে সে।

—ব্যাঙ্ক একথা শুনবে না, মা। ওর জন্য কিছু করা অসম্ভব।

সরসীবাবু বলে ওঠেন—ওর ভরসা করোনা প্রাণতোষ। তোমরা নিজেরা যেভাবে পারো, ছাখো, নাহলে এ বাড়ি চলেই যাবে। তাই হয়তো নিয়তি। শেষ বয়সে সব হারিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে একথা ভাবিনি বড় বৌ!

অনুতোষ-অণিমা চুপ করে বের হয়ে এল।

শিবুও ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা। তার ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে।

দু'একজায়গায় চাকরীর খবরও আসছে বাইরে।

হয়তো বাইরেই থাকতে হবে তাকে। তবু এবাড়ির জন্য সেই শান্ত পরিবেশের মায়াটুকুর জন্য আজ সেও ভাবনায় পড়েছে। মনোহরবাবুকে সে একটুও বিশ্বাস করেনা। তাই মনে হয় বৌদির ওকে অপমান করার মত অন্য কোন কারণ আছে সেটা মেজবৌদি ওদের কাছে বলতে চায়নি।

একটা পথ শিবুকে বের করতেই হবে।

আজ চা খাবারও আসেনি। বাড়িতে সব কেমন অগোছালো —স্তব্ধ ভাব এসেছে। রান্নাঘরে রাতের খাবার ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিয়েছে সুতপা। প্রাণতোষ বাবার ঘরে। সরমা মুখ বুজে বসে আছে।

অণিমা শিবুকে দেখে চাইল।

শিবু বলে—ব্যাপার কি মেজবৌদি! মনোহর কাকা আবার কি বলেছিল তোমাকে?

অণিমা গুম হয়ে বসে আছে। আজ যেন তার জন্যই এই সংসারে এমনি কালোছায়া নেমেছে। অণিমা বলে।

—এসবের জন্য দায়ী আমি নই শিবু। মনোহরবাবুর উপর এই আঘাত আসতোই! আমি না বললেও আসতো। আর এ বিপদ আমাদের উপর নামতোই। এখানে উপলক্ষ্য হয়েছি আমি।

তাতেও দুঃখ নেই। কিন্তু দুঃখটা কোথায় জানো? মনোহরবাবু তাঁর ওই জোচ্চুরিগুলো চাপবার জন্য আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর কাগজপত্র আমি সরিয়ে দিই, নাহয় কিছুটা সময়-এর ব্যবস্থা করে দিই!

—ঘুষ দিতে চেয়েছিল তোমায় ওই রাস্কেলটা? শিবু গর্জে ওঠে —ওটা একটা জানোয়ার। ঘুষ দিয়েই সকলের মুখ বন্ধ করে সকলের বিবেক নীতিকে কিনে নিতে চায়।

অণিমা বলে—তার দাম দিয়েছেন সাত হাজার টাকা। ওটা মেনে নিতে পারিনি। তাই তাকে চলে যেতে বলেছিলাম ঘর থেকে। আর বৌমা বলে ডাকতেও নিষেধ করেছিলাম।

অনুতোষ চুপকরে ওর কথাগুলো শুনছে। গর্জে ওঠে শিবু।

—রাইটলি সার্ভড! আমাদের আদর্শবান স্যারকে তাঁর বন্ধুর এই ব্যবহারের কথাটা বলোনি?

মাথা নাড়ে অণিমা।

শিবু বলে ওঠে—সেই রাগে আমাদের এ বাড়িটাকেই ও গ্রাস করতে চায়। উঃ! বুঝলে বৌদি—আমার যদি কোন উপায় থাকতো ব্যাটার টাকাগুলো ফেলে দিয়ে দলিলটা ফেরৎ নিয়ে ওর মুখদর্শন করতাম না। অবশ্য তার আগে ওর মুখের ফাউণ্ডেশনটাই বদলে দিতাম। ঠিক আছে—যা পারে ও করুক। মেজদা, দরকার হয় কোর্টেই চলো! সামনের সপ্তাহে রাউরকেল্লায় ইণ্টারভিউ দিয়ে আসি—তারপর আমার এক বন্ধুর বাবা বড় এডভোকেট তাঁর কাছে যাবো। তুমি স্যারকে বলো—বড়দাকেও বলছি আমি।

অণিমা কি ভাবছে। বলে সে।

—বিশ্বাস করো শিবু, ইচ্ছে করে এ বাড়ির উপর এই সর্বনাশ আমি আনিনি, আনতে চাইনি। আর একে রুখবার জন্য আমিও তোমার সঙ্গে আছি, থাকবো।

হাসে শিবু—তা জানি মেজো! দেখছি বড়দাকে বলে।

শিবু বের হয়ে গেল।

অনুতোষ চুপ করে বসে আছে। অণিমার কানে বাজছে শিবুর কথাগুলো। শিবু তাকে ভুল বোঝেনি। তবু শুধোয় অণিমা স্বামীকে।

—চুপ করে আছো যে! তুমি কিছু বলবে না?

অনুতোষ চাইল অণিমার দিকে। আজ অনুতোষ দেখছে একটি মেয়েকে যে তার কাছে আজ আশ্রয় চায়, নির্ভর চায়। অনুতোষ ও ভেবেছে কথাটা। মনোহরবাবু ওকে অপমানই করেছিল। বলে অনুতোষ।

—ওই মনোহর বাবুদের মত লোকরাই সমাজের সব কিছু নীতি বিবেক ন্যায়বোধকে টাকার জোরে কিনে নিয়ে মানুষকে অমানুষে পরিণত করে অণিমা। তার মত লোককে এই কথাটা জানিয়ে ঠিকই করেছো। যতবড় বিপদই আসুক তবু বলবো তুমি অন্যায় করোনি, ভুল করোনি।

এগিয়ে আসে অণিমা। এমনি একটি জবাবই সে পেতে চেয়েছিল। তাই বলে সে—আমার বড্ড ভয় করছিল গো!

—ভয় কিসের? অনুতোষ ওকে কাছে টেনে নেয়।

ওর দুহাতের নিবিড় নির্ভরে অণিমার চিরন্তন নারীমন কি সান্ত্বনা খোঁজে! সে ব্যর্থ হয় নি। জানতো অনুতোষ তাকে ভুল বুঝবে না।

তবু কথাটা অণিমা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। একটা পথ তাকে বের করতেই হবে। এ সংসারকে সেও ভালোবেসে ফেলেছে। শিবু, করবী, মা, বাবা এদের সে আঘাত দিতে পারবে না। ঘর হারানোর বেদনা থেকে বাঁচাতেই হবে তাদের।

এ বাড়িতে যেন শোকের ছায়া নেমেছে। খাওয়া দাওয়ার সময় ও আজ হৈ চৈ হয় না। কোনরকমে খাওয়া সেরে অণিমা অনুতোষ উঠে এসেছে ওদের ঘরে।

অণিমাই কথাটা ভাবছে। শিবুর কথা মনে পড়ে। অনুতোষ আলোটা নিভিয়ে মিত্তির বাগানের আঁধারের দিকে চেয়ে ছিল। স্ত্রীর কথায় চাইল।

অণিমা শুধোয়—কতটাকা পাবেন মনোহরবাবু এবাড়ির জন্য ?

অঙ্কটা সঠিক জানেনা অনুতোষ। তবু যা শুনেছিল সেইমত বলে—আন্দাজ হাজার তিরিশ হবে এখন সুদ নিয়ে।

অণিমা বলে ওঠে—যদি টাকাটা দিয়ে আমরা বাড়িটা মর্টগেজ ফ্রি করে নিই ?

অনুতোষ এত বিপদের মধ্যেও হেসে ফেলে। বলে সে—

তাতো হয়, কিন্তু তুমিও যে শিবুর মতই কথা বলছো। এত টাকা এখুনিই কি করে পাবো একসঙ্গে ?

অণিমা যেন আধারে আলো দেখছে। বলে সে—

ওর জন্য ভেবো'না। ও টাকা আমি আমার নামে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেব। তারপর দুজনের রোজকারে শোধ করে দেব। তবু বাড়িটা তো থেকে যাবে আমাদের হাতে।

অনুতোষ স্ত্রীর দিকে অবাক হয়ে চাইল।

—কি বলছো অণিমা ?

অণিমা বলে—তুমি বাপু বাধা দিও না। কিছু আরও দরকার পড়ে নীলুর কাছ থেকে নেব। বাবার সবটাকাটাই তো পড়ে আছে ব্যাঙ্কে !

অনুতোষ বলে—

সংসারের এতগুলো লোকের জন্য তুমি নিজে একা এতবড় ঝুঁকি নেবে ?

হাসে অণিমা—একা কেন ? তুমিও তো রয়েছো। আর আমার চেষ্টায় যদি এদের মুখে হাসি ফোটে, মেঘ কেটে যায়।

কেন করবো না! চলো, কালই মনোহর বাবুর সঙ্গে টাকার হিসাবপত্র করে ব্যাঙ্ক থেকে লোনের দরখাস্ত দিয়ে দিই।

বলে অনুতোষ—একটু ভেবে দেখো অণিমা!

অণিমা বলে—ভেবেছি গো! হ্যাঁ—মা বাবাকে এখন শুনিয়ে দরকার নেই। কথাবার্তা পাকা করে সব বলবো।

অনুতোষ এখন নোতুন একটি মেয়েকে দেখছে। অণিমা বলে

—কি দেখছো?

—তোমাকে। অনুতোষ বিস্মিত স্বরে বলে—তোমাকে যেন ঠিক চিনতে পারিনি অণিমা!

হাসে অণিমা—থাক! আর চিনে দরকার নেই।

নীলেশ এবাড়িতে মাঝে সাঝে আসে। এম-এ দিচ্ছে এবার ক্রমশঃ ওবাড়ির নিঃসঙ্গ পরিবেশটাকে মানিয়ে নিয়ে নীলেশ পড়াশোনায় ডুবে থাকে। পুরোনো চাকর নিতাই বলে—

আর তো কিছুই হবে না। দিনরাত শুধু পড়া আর পড়া এত পড়ে আরও দুটো হাত গজাবে। আমাদের গাঁয়ে বিষ্টু গুণ এমনি পড়তো ইয়া ইয়া বই। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ধম্ম-টম্মের বই পড়ে কথা বলে। তা নয় কি যে পড়িস!

হাসে নীলেশ—আর তুমি কি করো নিতাই দা? দিনরাত নিদ্রা দাও।

নিতাই বলে—আমি নিদ্রা দিই। বুঝলি ঘুমুলেও আমার কান খোলা থাকে এবার দিদি আসুক বলি—তোর বিয়েথার ব্যবস্থা করুক।

—তাহলেই তোমার নিদ্রা ছুটে যাবে অবশ্য আপাততঃ ওটা হচ্ছে না। তার চেয়ে তুমি ঘুমোও নিতাই দা। ওটা আমার পক্ষে নিরাপদ।

নিতাই-এর ঘুমটা একটু বেশী।

সেদিন ঢুলছে হঠাৎ জেগে ওঠে আবিষ্কার করে নিতাই তার

চোখের চশমাটা নেই। চীৎকার করে ওঠে নিতাই—চোর··· বুঝলি নীলু! চোর চশমা নিয়ে গেল।

ধড়মড় করে উঠে ওদিকে অণিমাকে হাসতে দেখে অবাক হয় নিতাই; ও ঘুমুচ্ছিল আর সেই ফাঁকে চশমাটা খুলে নিয়ে গেছে এবাড়িতে এসে অণিমাই।

নীলেশও বলে—চশমা গেছে, আরে সর্বনাশ। ও নিতাই দা চশমাই নয়, তোমার বাহারের গোঁফ জোড়াও দেখছি না। এটা—

গোফেঁর উপর নিতাই-এর খুবই মায়া। ওদুটো হারানোর সংবাদে নিতাই লাফিয়ে ওঠে—তাই নাকি! চোরে গোঁফ ও নেবে নাকি?

ব্যগ্র হয়ে হাত দিয়ে পরখ করে পুরুষ্টু গোফ জোড়াটা যথাস্থানে রয়েছে এটা যাচিয়ে নিয়ে ধমকে ওঠে নিতাই—

ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সাথে! দাও দিদি চশমাটা। তা ভালো আছো তো!

নীলেশ বলে—দিদি·এলেন একটু চা টা কিছু করো! আর ছাখো কি আছে!

—দেখছি। নিতাই ব্যস্ত হয়ে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে।

অণিমা বলে—একটু কাজে বেরুতে হবে, তোর জামাইবাবুও আসবে এখানে। এলে একসঙ্গে বের হবো।

নীলেশ শুধোয়—হাঁ কাজটা খুব জরুরী বোধ হয়। দুজনের বুদ্ধি লাগছে।

অণিমা বলে—তা লাগছে রে। দরকার হলে তোর কাছেও হাত পাততে হবে নীলু, অবশ্য ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা ম্যানেজ হবে। লোন নিচ্ছি!

অণিমা সব কারণটাই নীলেশকে বলতে নীলেশ বলে।

—এসব ব্যাপার বুঝি না। তবে বলবো বাড়ির আর সকলকে ছাপিয়ে তুই হামলে পড়লি কেন?

হাসে অণিমা—আমি নাকি উপলক্ষ্য রে! তাছাড়া ওদের সকলের জন্য যদি কিছু করতে পারি, দেখি না!

হাসে নীলেশ। বলে সে—খ্যাতি পেতে চাস্! নাম-যশ! লোকে বলবে লক্ষীমন্ত বউ! তা বাপু তোর শ্বশুর ফ্যামিলি নিয়ে আমি কোন কথা বলবো না। জেনে রাখ ওরা এক একটি চীজ! তবে হ্যাঁ অনুদা—শিবু ছাড়া! বাকী সবাই-এর মন কোনদিনই পাবি না এত করেও। আবার উল্‌টে কিছু না বলে।

অণিমা হাসে। শোনায় সে—তোর যত্তোসব ওসব বাজে ভাবনা রে!

নীলেশ বলে—তাই ওসব ভাবতে চাই না। টাকার দরকার হয় নিবি—ওসবতো ব্যাঙ্কে সুদে বাড়ছে।

নিতাই এর মধ্যে চা, খাবারও এনেছে। নীলেশ বলে।

—ছাখ, নিতাই দা কেমন কাজের! তা চায়ে চিনি দিয়েছো না লবণ দিয়েছো! ওটা তো তোমার নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা—

নিতাই চটে ওঠে—নেমক হারামি করিস না নীলু! নূন খেয়ে গুণ গাইতে হয়।

—তাই বলে চায়ের নূন খেয়ে? নীলেশ জবাব দেয়।

মনোহরবাবু অনুতোষ আর অণিমাকে আসতে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে যায়! সরকারকে দিয়ে ছুনম্বরী খাতাপত্র নিয়ে হিসেবে বসেছিল। ইশারায় ওকে ওসব সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে মনোহর চাইল ওদের দিকে।

অনুতোষ বলে—আপনার কাছে এলাম কাকাবাবু।

মনোহর বলে—আমিতো সেদিন বলে এসেছি অনুতোষ, টাকাটা ফেলে দাও বাড়ির দলিল দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখন টাকার দরকার।

অণিমা লক্ষ্য করে মনোহর তাদের বসতেও বলে না। তাকে যেন চিনে না এমনি ভাবই দেখায়। অনুতোষ বলে।

—টাকার ব্যাপারেই এসেছিলাম। তা কতো টাকা দিতে হবে। একটু জানা দরকার।

টাকা দেবার কথা শুনে মনোহর একটু অবাকই হয়েছে। ভেবেছিল অনুতোষ অনুনয় করতে এসেছে, অণিমাকে নিয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছে। সেও এবার একচোট শুনিয়ে দেবে।

কিন্তু তা না বলে টাকার কথা বলতে সে ওদের দিকে চাইল।

দেরাজ থেকে দলিল বের করে বলে—হিসাব করাই আছে. ধরো একত্রিশ হাজার সাতশো টাকা।

অনুতোষ বলে—ঠিক আছে। টাকাটা আমরা সামনের সপ্তাহেই দিয়ে দেব।

অণিমার দিকে চাইতে সেও জানায়।

—হ্যাঁ। ধরুণ সামনের মঙ্গলবারই পাবেন।

ধূর্ত মনোহর ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে, টাকাটা আসছে কোত্থেকে তাও বুঝতে পারে। মনে মনে হাতফস্‌কে বাড়িটা বের হয়ে যাবার জন্য এবার আপশোষ করে সে। সরসী বাবু বিক্রীর অনুমতি দিলে নিদেন ষাট সত্তর হাজার টাকা দাম উঠতো। সেখানেও কিছু দুনম্বরী কারবার করতো সে ক্রেতার সঙ্গে। ফলে আরও হাজার দশেক টাকা তার হাতে আসতো। সে সবই ফস্কে যাবে আর তাকে হার মানতে হবে ওই মেয়েটির কাছে এটা মনোহরের সম্মানে বাধে! এর মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে তার দুতিনটে গুদাম সিল করার কথা পাকা হয়ে গেছে।

মনোহর ওদের সহজে ছাড়তে চায় না। তবু বেশ আত্মীয়তার সুরে বলে ওঠে মনোহর—আরে বসো। বসো তোমরা। তা অনুতোষ টাকাটা বুঝি উনিই দিচ্ছেন?

অনুতোষ শোনায়—হ্যাঁ ওর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিচ্ছেন!

মনোহর একটু শ্লেষভরে বলে—তা নিজেদের ব্যাঙ্ক ওদের লোনের টাকা সহজেই আসবে আর ফেরৎ দেওয়া না দেওয়ার কথাই ওঠে না।

অণিমা চটে উঠেছে ওই মন্তব্যে। জবাব দেয় সে।

—তা নয়! বাড়িটা হাইপথিগেটেড হয়ে থাকবে ব্যাঙ্কে! বাবা আমার নামে একটা ফর্মাল সেল-ডিড করে দেবেন, ওটা ব্যাঙ্কে বন্ধক থাকবে। আর ওই টাকা মাস মাস আমার মাইনে থেকে কাটা যাবে। ব্যাঙ্কের টাকা আমাদের প্রতিমাসেই দিতে হবে।

মনোহর কথাটা মন দিয়ে শুনেছে। একটু পথও পেয়ে যায় চতুর লোকটা!

তখুনিই সে পরবর্তী পদক্ষেপের-কথা মনে ভেবে নিয়েছে। তবু সাংঘাতিক সেই মানুষটি বলে—

না! না। টাকা ফেরৎ দেবে বৈকি। তা ভালো। যোগ্য গুণবতীর কাজ করছে অনুতোষ তোমার স্ত্রী। ঠিক আছে। তাহলে মঙ্গলবার ফোন করে সব ব্যবস্থা করে নেব।

ওরা বের হয়ে আসে।

খেয়াল হয় অণিমার। বলে সে—অপিসে ফিরতে হবে। চলো!

অনেকটা হাল্‌কা মন নিয়েই তারা ফিরছে অপিসে। অণিমা বলে—লোনের দরখাস্ত করে দেব আজই!

অণিমাকে অফিসের সামনে নামিয়ে দিয়ে অনুতোষ ট্যাক্সি নিয়ে নিজের অপিসের দিকে চলে গেল। একটা মস্তবড় ভাবনা থেকে তারা নিষ্কৃতি পেতে চায়।

প্রাণতোষ বাবার কথামত দু' এক জায়গায় ঘুরে হতাশই হয়েছে।

সরসীবাবু আজ বলেন—তখনই বলেছিলাম বড়বৌ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিও না। ওই মেয়ে এবাড়িতে আসার পর থেকেই মনে হয়েছে আমার একটা সর্বনাশ ঘটবেই! অমঙ্গলের দূত হয়েই এসেছে ও! সেদিন আমিই ওকে আসতে বাধা দিয়েছিলাম, ওই মেয়ে তারই শোধ নিচ্ছে এবার শেষ বয়সে পথে দাঁড় করিয়ে।

সরমা চুপ করে আছে। স্বামীর কথাগুলো আজ নোতুন করে ভাবছে সে

সরমা বলে—প্রাণতোষ বরং দেশের বাড়িতে গিয়ে জমি-বাগান পুকুর বেচে যা পায় আনুক, যদি এ বাড়ি কোনরকমে রক্ষা হয়।

এমন সময় মনোহরকে ঢুকতে দেখে চাইলেন সরসীবাবু!

মনোহর আসতে ওদের আলোচনাটা থেমে যায়। আগেকার সেই সাদর আমন্ত্রণও নেই, এটা মনোহরবাবুও বুঝেছে। সরসী বাবু বলেন শুক্‌নো স্বরে।

—তোমার টাকার চেষ্টা করছি মনোহর, সাত দশ দিনের মধ্যে পারি দেব, নাহয় এ বাড়ি বিক্রীর ব্যবস্থাই হবে।

কথার শেষে কি অসহায় আর্তিতে গলা বুজে আসে সরসী-বাবুর।

মনোহর একট অবাক হয়। তার মনে দানা বাঁধা সন্দেহটা যেন সত্যি। ওরা বোধ হয় জানে না যে অনুতোষ অণিমা তার কাছে গেছল বাড়ীর টাকা দেবার কথা বলতে।

মনোহর বলে ওঠে—তাহলে যা ভেবেছিলাম সেটা সত্যিই। তাই কথাটা জানাতে এলাম সরসীদা, এ বাড়ির মর্টগেজ ছাড়াবার জন্য টাকা দেবার কথা বলে এল কালই অনুতোষ আর তার স্ত্রী। তারা আমাকে টাকা দিয়ে এ বাড়ি ওই অফিসার বৌ-এর নামে করে দিতে বলছে।

চমকে ওঠেন সরসীবাবু।

—সেকি! আমার বাড়ি—আমি জানলাম না ও টাকা দেবার কথা বলে এলো?

—ওরা তোমাকে জানায় নি? সে কি কথা? মনোহর বিস্মিত হবার ভান করে।

মনোহর দেখছে ওদের। এইবার মনোহর মুখুজ্যের জিব দিয়ে গরল বের হয়। বলে সে—

ব্যাঙ্ক থেকে নাকি বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা নিচ্ছে বল্লো! আর তা ওর নামে—বৌমার নামে লোন হবে।

তাই নাকি বাড়িটা তোমাকে এমনি ফর্মালি একটা সেল-ডিড

করে দিতে হবে অনুর বৌ-এর নামে, ব্যাঙ্কের টাকা শোধ হলে সেই বিক্রী কওলাটা ওরা বাতিল করে দেবে।

সরমা আনন্দ বোধ করে। বলে সে খুশী হয়ে—তাই নাকি : তাহলে বাপু একটা মস্ত কাজ হয়।

হাসছে মনোহর।

সে জানায়—তা হয়, তবে বৌঠান ওই বিক্রী কওলার কথা তোমাদের বলেনি, আর টাকা শোধ হবার পর যদি ওরা ওই সেল-ডিড ক্যানসেল না করে বাড়ির মালিক হবেন ওই মেয়েটিই! তোমাদের তখন করার কিছুই থাকবে না সরসীদা। অবশ্য তোমাদের ঘরের বৌ—তোমরা ভালো চেনো। যদি বিশ্বাস করতে পারো—লিখে দিও। মার প্যাঁচ তো বোঝ না।

আমার কর্তব্য তোমাকে সাবধান করে দেওয়া। আমার টাকা পাওয়া নিয়ে কথা, ওটা পেলেই খুশী। সে যেইই দিক না।

সরসীবাবু ব্যাপারটা এবার তলিয়ে, বুঝে অবাক হন। ওই মেয়েটি যে এবাড়ির অন্য ভাইদের বঞ্চিত করে এভাবে কৌশলে এদের সাহায্য করার নাম করে এতবড় সর্বনাশ করতে পারে তা ভাবতে শিউরে ওঠেন তিনি।

চাপা রাগে তিনি গরগর করছেন।

প্রাণতোষও ব্যাপারটি ভেবে বলে—বোধহয় তেমনি কোন মতলবই করেছে ওরা!

মনোহর বলে—

ওই বৌমাটি তোমার খুব বুদ্ধিমতী সরসীদা! আর বেশ কায়দা করে কিন্তু পথে বসাবার চেষ্টা করছে। অবশ্যি আমার এসব কথা বলা ঠিক নয়। তবু দাদা বলি তোমাকে—তাই বল্লাম।

অনুতোষ আর অণিমা ফিরছে নিশ্চিন্ত মনে। অনিমা আজ মিঃ বোসকে সব কথাই বলে টাকার জন্য দরখাস্ত দিয়েছে। মিঃ বোস প্রথমে সব শুনে অবাক হন। তিনি বলেন।

—ওই জয়েণ্ট ফ্যামিলি ওদের জন্য তুমি এতগুলো টাকার বোঝা একলা কেন বইবে ?

অণিমা বলে—মর্টগেজ ফ্রি করতে পারলে এতগুলো টাকার সুদ বেঁচে যায়। আর আপনিই তো বলেন যা করবে নিঃস্বার্থ ভাবেই করবে, বিনিময়ে কিছুই চাইবেনা। আমি সেই নিঃস্বার্থ ভাবেই ওদের জন্য এটুকু করতে চাই যাতে আশ্রয়টুকু ওদের না চলে যায়।

মিঃ বোস চুপকরে দেখছেন ওকে ! বলেন তিনি।

—স্ট্রেঞ্জ ! ঠিক আছে। দরখাস্ত কালই দিও গ্রাণ্ট করিয়ে দেব।

অণিমা খুশীমনে ফিরছে। সে বলে অনুতোষকে।

—তুমি বাবা মা বড়দাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো, তাহলে কথাটা সেরে টাকা দিয়ে দিই মনোহরবাবুকে।

অনুতোষ জানায়—বাঃ রে। একা আমি যাবো কেন ? তুমিও যাবে ঃ বাবা খুশী হবেন এতবড় বিপদে তবু তুমি বাঁচিয়েছো ওই পরিবারকে, সত্যিই তুমি না থাকলে বিপদে পড়তে হতো।

অণিমা বলে—চুপ করো তো !

দুজনে উপরে উঠে আসে হাল্‌কা মনে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ওরা।

মনোহর বাবু তখন জিব দিয়ে গরল ছড়াচ্ছে, কথাগুলো শুনে চমকে ওঠে অণিমা। অনুতোষও ভাবতে পারেনি এর মধ্যে মনোহর বাবু এখানে এসে তাদের সৎ প্রচেষ্টাকে এভাবে বিকৃত করে তুলে ধরবে এবাড়ির মানুষগুলোর সামনে ঃ বিষিয়ে দেবে তাদের মন !

অণিমা বলে ওঠে—এ সব কি বলছেন আপনি !

মনোহর চাইল ওর দিকে। ওরা যে এই সময়ই এসে পড়বে তা ভাবেনি। কি অন্যায় করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু মনোহর চতুর ব্যক্তি, সে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার কঠিন এক প্রতিক্ষার মুখোমুখি হয়ে শোনায়।

—যা করতে চলেছো তার ভালোমন্দ সব দিকই ব্যাখ্যা করে

দিচ্ছি ওদের সামনে মিসেস চ্যাটার্জি! আপনার সাদা মনে যদি কোন কাদা না থাকে তবে রাগ করছেন কেন? আর ওরা যদি বিশ্বাস করে আপনার ওই বিক্রী কওলা করে দেন আমার বলারও কিছু নেই। তাই জানতে এসেছিলাম সরসীদা—কবে ওটা করছেন, করতে হয় একটু তাড়াতাড়ি করবেন তাহলে টাকাটাও পেয়ে যাই! টাকা জমা না দিলে ওরা তো অফিস গুদাম সিল করবেন।

কঠিন কণ্ঠে সরসীবাবু বলেন—এসব আমি সহ্য করবো না মনোহর। দিন কয়েক সময় দাও, যে ভাবে হোক তোমার টাকা আমি দেব, সব না পারি এ বাড়ি বিক্রী করে দেব অন্যত্র তবু এই হীন জঘন্য লোভী একটা মেয়ের ষড়যন্ত্রে পা দেব না।

চমকে ওঠে অণিমা—বাবা! বিশ্বাস করুন এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র, লোভ আমার ছিল না—নেই। সকলের জন্যই আমি এতবড় ঝুঁকি নিতে চেয়েছিলাম। তবু বাড়িটা আমাদেরই থাকুক এই ভেবে। শুধু ব্যাঙ্কে একটা ফর্মাল সেল-ডিড থাকবে—ওটা টাকা শোধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবই ফেরৎ পাবেন।

অনুতোষ বলে—দাদা!

প্রাণতোষও সাড়া দেয় এবার।

—এত উপকারে আর দরকার নেই অনুতোষ। ছিঃ ছিঃ সকলকে বঞ্চিত করে নিজেদের দখলে আনতে চাস সবকিছু এইভাবে? এত নীচে নেমেছিস তুই ওই বৌমার বুদ্ধিতে!

সরসীবাবুও তার কর্তব্য স্থির করেছেন। এতকাল ধরে দেখেছেন ওই মেয়েটি ধীরে ধীরে এ বাড়ির মানুষদের বিভ্রান্ত করে লোভ দেখিয়ে যেন মুখ বন্ধ করে রেখেছিল এমনি চরম আঘাত দেবার জন্যই।

আজ সরসীবাবু বলেন—এ বাড়ির জন্য আর কোন রকম ভাবনা না করলেই খুশী হব বৌমা! আজ তোমাকে ওই পরিচয়ে ডাকতেও ঘৃণা বোধ করি। তাই বলছি, এই ঘৃণা লোভ লালসায় যার মত

বিকৃত তাকে আমি-ও দেখতে চাইনা। তোমারও এখানে থাকা উচিত নয়। দয়া করে তুমি এবাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাও।

আর্তনাদ করে ওঠে অণিমা—কি বলছেন বাবা!

অনুতোষও চমকে ওঠেছে—এতবড় কথা ওকে বলতে পারলেন বাবা!

সরসীবাবু বলে।

—হ্যাঁ! এই আমার শেষ কথা। আর একথা বলতে আমি বাধ্য হয়েছি অনুতোষ! ওকে যেতে বলো। এ বাড়িতে সাপের বিষ ঢালার জন্য ওকে পুষতে রাজী নই। তাতে এবাড়ি যাক, কোন দুঃখ নেই।

সরসীবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে মনোহর বলে।

—এত উত্তেজিত হয়োনা সরসীদা! ঘরের বৌ, তাকে চলে যেতে বলছো এটা কি ঠিক হবে?

—ঠিকই পথ নিয়েছি মনোহর। তুমি সত্যিই অনেক উপকার করেছো নইলে ও এ-বাড়ির আরও সর্বনাশ করতো!

মনোহর বেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দৃশ্যটা। খুশী হয়েছে সে অণিমার জলভরা বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে। মনোহরও ঠিক এমনি ভাবেই আঘাত দেবার পরিকল্পনা করে এসেছিল। তার কারবারে বিপর্যয় এসেছে ঐ মেয়েটির জন্যই। ওকেও ছেড়ে দেবে না মনোহর! ওরও সবকিছু ঘরবাঁধার স্বপ্নও শেষ করে দেবে সে।

মনোহর তবু অপরাধীর মত ভঙ্গীতে বলে।

—তোমাদের ঘরের ব্যাপারে আমাকে কেন জড়াচ্ছো দাদা। তাই বলছিলাম, ক্ষমাঘেন্না করে দাও ওকে।

সরসীবাবু বলেন—না! অনুতোষ ওকে যেতে বল! কাল সকালেই যেন এবাড়ি থেকে ও চলে যায়। এ বাড়ির ও আর কেউ নয়! আর তোর সঙ্গেও ওর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

মনোহর খুশীতে চমকে ওঠে।

অনুতোষ সবই জানে। দেখেছে সে একজনের ভালোমানুষীর অপরাধে তাকে তারা এই চরম শাস্তি দিতে চলেছে।

অনিমার দু'চোখে জল নামে।

অনুতোষ বলে—বিনাদোষে ভুল বুঝে এই মনোহর কাকার কথায় তোমরা ওকে এতবড় শাস্তি দিতে চলেছো কেন ?

মনোহর চাইল অনুর দিকে।

অনুতোষ বলে—মনোহর কাকার পরিচয় আমিও কিছুটা জেনেছি। ওর অন্ধকারের খবরও জেনেছি। ব্যাঙ্কের লাখ লাখ টাকা মেরে আজ সব দোষ অণিমার ঘাড়ে চাপাতে চান। এ-বাড়ির উপর ওর লোভই বেশী, আমরা বাধা দিয়েছি তাই উনি এসে এইভাবে আপনাদের মন বিষিয়েছেন। সব না জেনেই আপনি এসব করতে যাচ্ছেন।

মনোহর এবার একটু চড়াস্বরে বলে—আমাকে বদনাম দিচ্ছো তুমি ওই মেয়েটার কথায় ? আমি জোচ্চোর—টাকা মেরেছি ?

অনুতোষ বলে উঠে—তবে ঘুষ দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে কেন গিয়েছিলেন ? বলেন নি সাত হাজার টাকা দেব ?

—মিথ্যে কথা। সরসীদা তুমি এসব কথা শুনছো ? তোমাদের উপকার করে শেষকালে এতবড় অপবাদ সইতে হবে ?

সরসীবাবু এবার বলে ওঠেন—ওসব কথা থাক অনু ! ওকে যেতে বলো এ বাড়ি থেকে। শান্ত হও মনোহর ! বসো।

অনুতোষ দেখেছে, এ বাড়িতে ওদেরকে নয় মনোহরবাবুকেই বেশী দরকার। অনুতোষ বলে.

—তাই যাবে বাবা। তবে একা ও নয়, আমিও যাবো। যে বাড়িতে এককথায় বিনাদোষে স্ত্রীর এতবড় শাস্তি হয় সেখানে স্বামীরও কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যের জন্যই আমিও এ বাড়ি থেকে চলে যাবো। তোমাদের প্রাপ্যটুকু পৌঁছে দেব মাসে মাসে, ভয় নেই ! চলো অণিমা।

—অনু! চাপা আর্তনাদ করে ওঠে সরমা। মায়ের মন মানে না তাই।

সরসীবাবু বলেন—ওদের যেতে দাও বড় বৌ। এ সংসারে ওদের না থাকাই ভালো।

মনোহরও সায় দেয়।

—কথায় বলে দুষ্টু গরু থেকে শূন্যি গোয়াল ভালো! চলি সরসীদা! আমিও বড ব্যাথা পেয়ে গেলাম। তাহলে পরে দেখা হচ্ছে।

সব ব্যাপারটা শিবতোষও দেখেছে। এবাড়ির সম্বন্ধে একটা চাপা বিরক্তিই বোধ করে সে। মনোহরবাবুর দিকে চেয়ে থাকে শিবু। ওকে যেতে দেখে এবার বলে।

—আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে তাহলে?

মনোহর চড়টা যেন হজম করার চেষ্টা করে বলে,

—একি বলছো শিবু বাবাজী। সত্যি বড় ব্যথা নিয়ে গেলাম! এসব করুণ ব্যাপার আমি সইতে পারি না! মনটা বড় কোমল কিনা!

শিবু ওর দিকে চেয়ে থাকে।

অণিমার দুচোখে জল নামে।

অনুতোষ বলে—দুঃখ করো না অনিমা, ঘর বাঁধতে চেয়েছিলে যার উপর সেটা চোরাবালিই। এবার আর সে ভুল হবে না। এবার নতুন করে ঘর বাঁধবো, তুমি আর আমি।

হঠাৎ শিবুকে ঢুকতে দেখে চাইল অনিমা! শিবু এগিয়ে আসে —মেজো, তুমি নাম্বার ওয়ান বোকা মেজো। চোখের জলের মত দামী জিনিষ তুমি এই ঘরের জন্য ফেলছো—যে ঘর তোমাকে তাড়াতে দ্বিধা করে না, তাদের জন্য ফেলছো যারা তোমাকে চেনবার চেষ্টাও করেনি।

অণিমা ওর দিকে চেয়ে থাকে—শিবু।

শিবু বলে ওঠে—রাউরকেল্লায় একটা চাকরীর কথা হয়েছে,

আমিই মত দিইনি। কালই ওখানে চলে যাবো মেজো। তখন এ বাড়ি ছেড়ে যেতে মন চায় নি, এখন দেখছি তুমি থাকবে না এবাড়ির চলও বদলে যাবে! তাই আমিও সরে যাচ্ছি।

—কি বলছো শিবু? অনিমা ওকে বাধা দিতে চায়।

শিবু বলে—এটা বড় কঠিন নিষ্ঠুর মেজো, সংসার বোধ হয় এমনিই। তাই সরে থাকাই ভালো। তোমরাও চলে যাও ঠিকানাটা জানিও বৌদি। এলে যেন দেখা হয়।

শিবু চলে গেল।

এ বাড়ির সেই হাসি আনন্দের দিনগুলো হারিয়ে যাবে। সবই হারিয়ে যায় কালের আবর্তে। একদিন এই কালই সবকিছু হাতের কাছে এনে দেয়, অর্থ-প্রীতি সব। আবার সবকিছু কালের গতি-প্রবাহেই দূরে কোথায় বয়ে চলে যায়।

তবু জীবনের গতি থামে না। সে এগিয়ে যায়, অন্তহীন পথের নতুন প্রবাহে।

নীলেশ-এর শূন্য ঘর ক'দিন ভরে উঠেছিল দিদি জামাইবাবু আসতে। নীলেশ তাই বাধা দেয় অণিমার কথায়।

—এতবড় বাড়ি পড়ে আছে, দুজন মানুষ আবার নতুন ফ্ল্যাট দেখতে গেলি ওপাশে। আমি কি পরই হয়ে গেলাম রে! তাছাড়া তুই আসায় নিতাই দা মন দিয়ে রান্না করছিল, তুইও দু'একটা পদ রাঁধছিলি ভালোই ছিলাম ভোজনবিলাসে! না গেলেই কি নয় রে? কি অনুদা?

অনিমা বলে—মা রে! পাশেই তো রইলাম। তাছাড়া কি জানিস? এ বাড়িতে থাকলে লোক মানে শ্বশুরবাড়ির ওরাও তোর জামাইবাবুকেই খোঁটা দেবে বৌ-এর পাল্লায় পড়ে ঘরজামাই হয়ে গেল!

নীলেশ ধমকে ওঠে—বলুক গে ওরা! ঘরই নাই আবার ঘর জামাই? এতো বাবা সরাইখানা! দুদিনকা মেহমান!

—তাই ওখানেই যেতে হবে। তুই তোর চেনা জানা ফার্নিচারের দোকানদার বন্ধুকে বলে দে—ওই ঘরে কিছু ফার্নিচার পত্র দিয়ে যাক!

নীলেশ বলে—হবে! এখন খা তো বাপু! নতুন ঘরের স্বপ্নে নাওয়া খাওয়াতো ভুলে যাবি? নিতাইদা—তোমার কাজও বাড়লো। সেই ভাইবৌ—না কার চাকরীর কথা বলেছিলে?

—আমার ভাইবৌ মানে বৌদি—এই পাড়াতুতো আর কি!

নীলেশ বলে—মানে আমি জানি! তাকেই যে এবার প্রয়োজন হবে নিতাই দা! দিদির একটি বাহনের দরকার। মানে হাত-টান থাকবে না—রান্নায় তোমার মত লঙ্কা ঠাসবে না—আর ধমক ধামক দেবে না, মিষ্ট ভাষী—ছিমছাম হবে।

নিতাই চমকে ওঠে—তালে কুমোরটুলিতে যাওনা কেন? ওটার কথা ছাড়ো দিদিমণি, ভালো কাজের লোকই দেব তোমাকে।

নীলেশ বলে—ব্যস! অল এ্যারেঞ্জমেন্ট রেডি। তাহলে গৃহ প্রবেশ করে ফ্যালো এবার।

এ-এক নতুন পরিবেশে এসে উঠেছে অনুতোষ আর অণিমা।

শান্ত স্তব্ধ ছোট ফ্ল্যাটটাকে অণিমা মনের মত করে সাজিয়েছে। অবসর সময় অনেক, তাই বইপত্র পড়তে পারে। বসবার ঘরটাকে কার্পেট সোফা সেটের নকসার রং মিলিয়ে ঢাকা দিয়ে সাজিয়েছে, বুকর‍্যাক-এ বেশ কিছু বই।

অপিস আর বাড়ি!

পুরোনো বাড়ির হৈ চৈ নেই, শান্ত নির্জন এই পরিবেশে দুজনে যেন দুজনকে নতুন করে পেয়েছে তারা। যৌথ পরিবারের অলিখিত কানুনের শাসন নেই, অনেকের প্রতি কর্তব্যের সজাগ দৃষ্টির দরকার হয় না। একক ছোট্ট একটি বিন্দু। স্বয়ং সম্পূর্ণ।

কাজের মেয়েটি সত্যিই ভালো। নিতাইদাও যখন তখন এসে তাকে এটা ওটা বুঝিয়ে দেয়। বাসনাও ক'দিনে এ সংসারের

একজন হয়ে গেছে। সবই শিখে নিয়েছে শুধু এই বাঁশীকল টাকে একটু রপ্ত করতে পারেনি। প্রেস্টিজ কুকারের এই সিটি বাজলে সে নাকি ঘাবড়ে যায়। অনিমা বলে—দেখে নাও, বাঁশী বাজলেই হয়ে যাবে।

আর নীলেশ এম. এ. পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেটা চুকে যেতে নীলেশও সন্ধ্যায় এসে জমিয়ে আড্ডা দেয়। ওর দিল-খোলা হাসি—কথাগুলো এ বাড়ির স্তব্ধতাকে ঘুচিয়ে দেয়। তবে এই কিছুক্ষণের জন্যই।

নীলেশ বলে—না, ছোড়দি তুই এমন একটা শহীদ হবার চান্স পেয়েও ইউটিলাইজ করতে পারলি না। ক্লিন বোল্ড আউট হয়ে গেলি ও বাড়ি থেকে। এখন বুঝি অফিস নিয়ে পড়েছিস? মানে তোদের ব্যাপার কি জানিস? কারো জন্য কিছু করতেই হবে। করে যা বাবা!

অনুতোষ বলে—এবার তোমার জন্যই সত্যিকার কিছু করার কথা ভাবছে।

—অর্থাৎ? অবাক হয় নীলেশ!

—তোমায় একটি বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করবেন।

অনুতোষের কথায় লাফ দিয়ে ওঠে নীলেশ—ওইটি করিস না দিদি। দিব্যি তোফা আছি। এখন তো বেকার—আর চাকরী পেলে ওইতো অধ্যাপনা—ওই নিয়ে থাকবো। এমন কাজও করিস না। রিয়েলি আমি তোর কোনও ক্ষতি করিনি। তবে কেন এই রিভেঞ্জ?

হাসছে অণিমা।

রাত্রি নামে।

সেই বড়বাড়ির মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে অণিমার। অনুতোষ বলে—দাদা এসেছিল, ওরা দেশের বাড়ি জমি—বাগান বিক্রী করছে শুনলাম মনোহর কাকাকে টাকা দেবার জন্য।

অণিমা চুপ করে থাকে।

আর যেন ওনিয়ে ভাবতে চায় না সে। অণিমার মনে হয় অনুতোষ ও বাড়ি থেকে এসেছে এখানে, অণিমা তাদেরই আঘাত দিয়েছে। হয়তো অনুতোষও মনে মনে সেই কথাটা ভাবছে।

অণিমার কথায় চাইল অনুতোষ।

অণিমা বলে—তুমি রাগ করেছো, না?

—কেন?

—তোমাকে ও বাড়ী থেকে এখানে চলে আসতে হয়েছে আমার জন্য। আমিই সরিয়ে নিয়েছি তোমায়?

অনুতোষ বলে—ও বাড়ির কেউ আমাদের চায় না অণিমা। শিবুর ভালো চাকরী হয়েছে, দাদারও প্রমোশন হচ্ছে। তোমাকে বলিনি—কাল গেছলাম, বাবা ঠিক ভালো করে কথাই বললেন না। মা-ও এড়িয়ে গেল।

অণিমা দেখছে স্বামীকে।

ওর হাতখানা অনুতোষের হাতে। অনুতোষ বলে।

—এই ভাল অণিমা। কাউকে আমাদের দরকার নেই। আমরা দুজনেই এই কঠিন দুনয়ায় যে ভাবে হোক মাথা উঁচু করে থাকবোই। ওদের দয়ারও দরকার নেই।

অণিমা নিজেকে অনুতোষের হাতে সঁপে দিয়েছে।

সংসারের বাইরের জীবনের কোন কাঠিন্য এখানে পৌঁছে না। জীবনের এই নোতুন রূপ—দুজনের সান্নিধ্য তাদের শক্তি যোগায় সব ছাপিয়ে নোতুন করে বাঁচতে।

অফিসে কাজের ঝামেলাও বেড়েছে অণিমার।

তবু অণিমা নিঃসঙ্গতাকে ভোলার জন্যই অফিসের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। অভিজিৎও দেখেছে সেটা। শুনেছে ওর পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা।

মিঃ বোস সেদিন ফাইলটা দেখে একটু অবাক হন, অণিমার নামে

লোন স্যাংসন হয়েছে, অথচ নেয় নি টাকাটা। অভিজিৎই কথাটা জানাতে তিনি অবাক হয়ে ওকে ডেকে পাঠান নিজের ঘরে

অণিমা এর মধ্যে দেখছে তাদের অপিসের দু'একটা অদৃশ্য হাত যেন কিছু লোন ফাইলে কারচুপি করার চেষ্টা করছে তার মধ্যে মনোহরবাবু, রতনলাল শেঠ আরও কিছু লোকের কেস আছে। মনোহরবাবুর কেস কোর্টে উঠেছে। আর অনেক খবরই বের হয়েছে তার সম্বন্ধে। স্পেশাল পুলিশও নাকি হানা দিয়েছে ওর অন্য গুদামে, বেশ কিছু চোরাই মালপত্র পাওয়া গেছে।

রীতিমত এইসব কাজও করেন তিনি।

মনোহরবাবুর কেসটার প্রেসি করছে নিজে অণিমা ওর রিটপিটিশানের জবাব যাবে ল' ডিপার্টমেণ্ট থেকে। অণিমা ইনটারকম ফোনে মিঃ বোসের গলা শুনে বলে।

—আমি আসছি স্যার! দুটো পয়েণ্ট একটু ডিস্‌কাসন দরকার!

মিঃ বোস-এর স্বভাবটায় বৈচিত্র আছে।

যখন কোন সমস্যা ঘনীভূত হয়ে আসে কাজের জটিলতা বাড়ে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোন নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে তখনই তিনি বেশ সহজ-হালকা হয়ে ওঠেন। টেবিলে আনমনে আঙ্গুল ঠোকেন না হয় সেক্রেটারিয়েট চেয়ারে হেলান দিয়ে মৌজ করে পাইপ ধরিয়ে চোখবুজে উপভোগ করেন মৌজটা।

অণিমাকে দেখে বলেন—এসো!

অণিমা জানে উনি কর্মব্যস্ত মানুষ। তাই নিজের কাজের কথাটাই পাড়ে সে—স্যার, মনোহর বাবুর রিট পিটিশানের জবাবটার জন্য ল' ডিপার্টমেণ্টকে কিছু ডাটা দিতে হবে।

মিঃ বোস ওর দিকে চেয়ে ফাইলটা হাতে নিয়ে বলেন।

—বেশ তো! হ্যাঁ, এতবড় নাটক ঘটে গেল—কিছু বললে না? ওবাড়ি থেকে চলে আসতে হোল এই মনোহর বাবুর জন্যই? না!

অণিমা চুপ করে থাকে।

মনোহর বাবুর শয়তানীর বলি হয়েছে সে। সব হারিয়ে গেছে তার।

অণিমা উত্তর দেয়—জানাবার মত কিছু নয়। ও যে এভাবে আমাদের পিছনে লাগবে তা ভাবিনি।

মিঃ বোস বলেন—এখন তো ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই খবর পাচ্ছি। আমরা ওকে ছেড়ে দেব না। অভিজিৎ, ইউ টেক চার্জ অব দিস্ কেস। অণিমা, তোমার ফ্ল্যাটের রেন্টবিলটা অপিসে জম দেবে—এসটাবলিসমেণ্ট তার খচা বিযার করবে।

অণিমা দেখছে ওই লোকটিকে।

মিঃ বোসও ব্যাপারটা নিয়ে বেশ বিব্রত বোধ করেন।

—আই সিমপ্যাথাইজ ইউ মাই পুওর গার্ল। তবে কি জানো, আজকের এই অর্থনৈতিক চাপে, মানুষও বদলে যায়, বদলাচ্ছে সংসারের কাঠামো। আজ প্রত্যেকেই আমরা নিঃসঙ্গ—তাই একে সহ্য করতেই হবে।

অণিমা উঠছে। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে যায়, চোখের সামনে অন্ধকার নামে। দূর থেকে কার ডাক শুনছে—মিসেস চ্যাটার্জি! অণিমা!

অণিমার সাড়া দেবার সাধ্য নেই। সে যেন দূরে কোথায় সরে যাচ্ছে নিবিড় আঁধারের অতলে।

জ্ঞান ফেরে যখন, অবাক হয় অণিমা।

সবিতা নিবেদিতা আরও মেয়েরা এসেছে। অপিসের ডাক্তার সেনও রয়েছেন।

ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ বোস, অভিজিৎ আরও ক'জন। অণিমার চুল-শাড়ি ভিজে, উঠে বসতে যাবে সে, ডাঃ সেন বাধা দেন।

—আর একটু রেষ্ট নিন, ঠিক হয়ে যাবে।

মিঃ বোস বলেন—অনেক টেনশন গেছে অণিমা। ইউ হ্যাভ এ থরো চেক আপ, এ্যাণ্ড সাম্ রেষ্ট! ছুটিতো নাওনি-অনেকদিন,

ছুটিই নাও। দরকার হয় বাইরে ঘুরে এসো। আমিও অনুতোষকে বলছি।

শান্ত অবসর জীবনই নয়, অণিমার জীবনে এসেছে পূর্ণতার সংবাদ। সব মেয়ের জীবনেই আসে। সারা মন কি নীরব তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, অনুতোষ বলে।

—এবার কিন্তু শূন্য ঘর তোমার পূর্ণ হল অণিমা। একজন আসছে তাকে মানুষ করার দায়িত্বই বাড়লো।

—তুমি কি খুশী হও নি? অণিমার চোখে কি সংশয় ফুটে ওঠে।

অনুতোষ বলে—বাঃ রে খুশী হবো না কেন?

সবিতাই মাঝে মাঝে আসে অণিমার কাছে। সবিতাও এখন বদলে গেছে।

তার দেহেমনে এসেছে পরিবর্তনের ছায়া। সেও বুঝেছে পুরুষের চোখে তার কোন আকর্ষণ নেই। তাই সবিতাও নিঃসঙ্গ জীবনকে মেনে নিয়েছে। তবু মনের অতলে চাপা বিক্ষোভ একটা রয়ে গেছে।

অপিসের গল্পও করে সবিতা, নিবেদিতার নাকি স্বামীর সঙ্গে গোলমাল চলেছে। আর ডেসপ্যাচের নোতুন মেয়েটিরও নাকি অনেক ইতিহাস আছে।

হাসে অণিমা—ওসব ব্যাপার ছেড়ে দাও সবিতা!

সবিতা ইদানীং কোন আশ্রমেই যাতায়াত করে। সবিতা বলে।

—ওসব খুব খারাপ অণিমা। মেয়েদের মন থাকবে সংসারে' না হয় দেবতার পায়ে। গুরুদেব তাই বলেন। একদিন নিয়ে যাবো তোমাকে অণিমাদি গুরুদেবের কাছে। দেখবে জীবন ধন্য হবে!

অণিমা কিছু বলে না। তার সেই গুরুদেবকে দর্শন করে সবিতা যে ধন্য হতে পেরেছে এটাও মনে হয় না।

সবিতা তবু এবাড়িতে মাঝে মাঝে আসে, নীলেশ ওকে দেখে সরে যায়।

সবিতা চলে যেতে নীলেশ ঘরে ঢুকে বলে।

—এমনি গুরুভক্তি পরায়না মহিয়সী মহিলা তোদের অপিসে কটি আছে রে? উস্!

অণিমা হাসে—বড় ভালো মেয়ে রে!

—মাথায় থাক বাবা। হ্যাঁ—ওষুধপত্রগুলো ঠিকমত খাচ্ছিস তো? ডাক্তার মুখার্জি কি বলেন?

অণিমা বলে—আমি ঠিক আছি। ও বাড়ির খবর কি রে?

অণিমার কথায় নীলেশ ওর দিকে চাইল। কোথায় যেন অণিমার মনে একটা ক্ষীণ সুর ওঠে। এখনও সেই বাড়ীর মানুষগুলোর কথা ভুলতে পারে না সে। শিবু বাইরে, শাশুড়ী-বড় জা হয়তো এর মধ্যে একবার আসবেন ভেবেছিল। কিন্তু কেউ আসেনি তাকে দেখতে।

বিজয়ার সময় করবী একটা পোষ্টকার্ডে প্রণাম জানিয়ে ওবাড়ির সম্বন্ধে কিছু ভালো খবরই দিয়েছিল। শিবু এসেছিল একদিন ঝড়ের মত।

সেই রাত্রেই রাউরকেল্লা ফিরে গেছে। তাকে নাকি বাইরে পাঠাবে ওরা—হায়ার ট্রেনিং-এর জন্য। আর কেউ কোন খবরই নেন নি।

নীলেশ বলে—তুই ওদের জন্য ভাবিস? ওরে সংসারটাই এমনি

এখানে ভ্যাকুয়াম থাকে না তোর অভাবটাকেও ওরা মানিয়ে নিয়েছে।

হয়তো তাই!

অনুতোষ বৈকালে ফেরে। অনুতোষও জানে অণিমার মনের খবর।

সেও বলে—এসব নিয়ে ভেবো না অণিমা। ওদের কর্তব্য ওদের কাছে। টাকাটা নিতে পারে আমার কাছ থেকে, মুখ ফুটে তোমার খবর তারা নিতে লজ্জা পান।

তবু অণিমা বলে—একদিন আসতেই হবে। আমার জন্য না হোক—যে আসছে তার জন্যও।

অনুতোষ চুপ করে কি ভাবছে। দেখেছে সে ও বাড়ির মানুষ গুলোকে। যেভাবে হোক ও বাড়িটা তারা রেখেছে। আর মনোহরবাবুর যাতায়াতও আছে আগেকার মতই ওখানে।

আজও দেখা হয়েছিল মনোহর বাবুর সঙ্গে।

অনুতোষ বলে—মনোহর কাকা ওখানে দিব্যি যায়! আজ তোমার খবরও নিচ্ছিল। তবে দেখলাম একটু মুষড়ে পড়েছে। বল্লো—আমার অপিসেও তাকে একবার আসতে হবে।

অনুতোষ এক্সসাইজ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। অনেক বেআইনী মাল গার্জ-আফিম-এসবের কেসও হয়। ওখানে যারা আসা যাওয়া করে তারা ওই জগতের মানুষ!

অণিমা বলে—ওই লোকটা আমার পিছনে লেগে এতকাণ্ড করে এবার তোমার পিছনেও লাগতে চায়, একটা শয়তান। ওকে আস্কারা দেবে না।

অনুতোষ বলে ওঠে—ওসব কথা থাক অণিমা। ওকে আমি চিনেছি। হয়তো তোমাদের ব্যাঙ্ক-এর মামলা নিয়ে কোন কথা বলতে চায়।

সন্ধ্যা নামছে।

অণিমার ছোট সংসারে সেও সন্ধ্যাদীপ জ্বালে। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে গৃহ দেবতার কাছে। আজ সে মা হতে চলেছে। তাই ভয় হয়। মনের অন্তরে জাগে একটি তৃপ্তির সুর। সব শূন্যতার মাঝে সেই সম্বলটুকু তার মনে আশ্বাস আনে।

তাই সারা মন দিয়েই অণিমা গ্রহণ করেছে তার সন্তানকে।

অনুতোষ অণিমা আর সীমা এই ফ্ল্যাটের পরিবেশে তিন জন মিলে যেন সেই ছোট্ট পারিবারিক বৃত্তটিকে ছুঁয়ে একটি স্বর্গ রচনা করতে চায়। ছোট্ট কচি মেয়েটা এ বাড়িতে নোতুন সাড়া এনেছে।

নীলেশও সবে একটা কলেজে চান্স পেয়েছে।

ওর অবসর সময় কাটে সীমাকে নিয়ে। ছোট্ট মেয়েটি ওদের

আদরেই মানুষ হয়। বাকী সময়টা সীমা এবাড়ির কাজের মেয়ে বাসনা আর নিতাই সর্দারের জিম্মায় থাকে।

ক্রমশঃ নোতুন প্রশ্ন আসে নোতুন দিনের সঙ্গে। অণিমা এগুলোর কথা ভাবেনি। নিজের অপিসের ঝামেলা আছে, দায়িত্ব বাড়ছে। অনুতোষ আর অণিমাকে এখন চাকরীর জন্যই ভাবতে হয়। মানুষের সুন্দর ভাবে এই বাজারে বাঁচার জন্য মাশুল যোগানো কষ্টকর।

তবু সব [illegible] তাদের সহ্য হয়ে যায় ওই একটি শিশুর মুখ চেয়ে। [illegible] বেশীর ভাগ সময় ওর সঙ্গী। সেইই তার খাতিরে কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেছে। অণিমা অপিস যাবার মুখে ওকে তাদের গাড়িতে স্কুল পৌঁছে দেয়। নীলেশ নিয়ে আসে নাহয় স্কুলের গাড়িতেই ফেরে সীমা।

বব্ চুল, ফর্সা সুন্দর ধারালো চেহারা। এখন থেকেই দুরন্ত। খেলাধূলোয় সেও নাম করেছে। সেই সঙ্গে বোধ হয় জেদটাও বেশী!

সীমা স্কুলে দেখেছে ইরা-মায়া-শুভা আরও অনেক বন্ধুদের বাড়ি থেকে গাড়িতে করে তাদের ঠাকুমা—না হয় দাদু—না হয় কাকারা আসা যাওয়া করে।

ইরার দাদু দেখতে খুব সুন্দর। ওদের সকলের জন্য লজেন্স টফি আনে। সেদিন ইরার দাদু ওকে আদর করে।

—গুড্ গার্ল!

দাদুরা বোধ হয় অমনি মিষ্টি হয়। আর শুভার ঠাকুমা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—শুভার জন্মদিনে আসবে কিন্তু সীমা।

সীমা ঘাড় নাড়ে।

ওদের সকলেরই অনেক কিছু আছে। দিদা—দাদু কেমন ভালো আছে ওরা।

শুভা হাত নেড়ে গাড়িতে উঠে গেল। একাই দাঁড়িয়ে আছে সীমা। তাকে নিতে দিদা দাদু কাকু কেউ আসে না। মাঠটায় ভিড় কমে গেছে।

দারোয়ানের ডাকে চাইল সীমা।

—তিন নম্বর গাড়িতে বাড়ি যাবে তো? চলো মিসিবাবা।

সীমার মনে নীরব একটা শূন্যতা ঠেলে উঠছে। মনে হয় ওকে জানাবে বাড়ি সে যাবে না। তবু মুখবুজে গিয়ে ওদিকের গাড়িতে উঠলো। বৈকালের আলো নামছে সীমার মুখেও অমনি আঁধার জমে।

বোধহয় বাড়ি ফিরে মা বাবা কাউকে না দেখে আরও বুক ঠেলে ওঠে জমা বিক্ষোভটা। বাসনা দুধ সন্দেশ এনেছে

—খেয়ে নাও!

—মা কোথায়?

বাসনা বলে—এসে পড়বে! তুমি খেয়ে নাও।

—না!

মুখ ভার করে বসে থাকে সীমা।

অণিমা অনুতোষ অফিস থেকে নিউমার্কেটে গেছে কিছু কেনাকাটা সেরে ফিরে আসবে। এই এলাকার সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়ানো।

সেদিন ওরা এদিকে এসে ঘুরতো, আজও যেন অনুতোষ তেমনি ছেলেমানুষি করে—এ্যাই চলনা কারকো তে খেয়ে যাই!

অণিমা বলে—দেরী হবে। ওদিকে সীমা এসে পড়বে।

—বাসনা আছে। দেরী হবে না। তখনতো প্রায়ই যেতে।

অণিমার এখন দায় বেড়েছে, সংসারের কথা ভাবতে হয়। পুরুষ মানুষ এদিকে চিরকালই যেন কিছুটা মুক্ত, পুরুষরা ভালোবেসে ঘর ছাড়তে পারে, কিন্তু মেয়েরা ভালোবাসে ঘর বাঁধার জন্য।

অণিমা বলে—তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু!

অনেকদিন পর অণিমাও যেন নিজের হারানো মুক্ত জীবনকে ফিরে পায়। খেয়ে দেয়ে একটু ঘুরে বাড়ি ফিরতে সীমা বের হয়ে আসে। তখনও যেন সেই রাগটা তার মন থেকে যায় নি।

অনুতোষ ওর দিকে চেয়ে থাকে। অণিমা প্যাকেট থেকে ছিটটা বের করে বলে—তোর জন্য আনলাম সীমা।

সীমা বলে ওঠে—ওসব ছিট চাইনা। একদম বাজে! ইরার মত এয়ারলাইন ফ্রক বানাবার ছিট আনতে বললাম। কি আনলে? নেবনা ওসব।

অণিমা মেয়ের দিকে চাইল।

ওযেন আজ মায়ের মুখের উপরই প্রতিবাদ করার জন্য প্যাকেটটা আছড়ে ফেলেছে।

অণিমাও চটে ওঠে—সীমা! ফেললে কেন ওটা?

—বেশ করেছি! সীমা ফুসেঁ ওঠে।

অণিমাও এগিয়ে এসে সজোরে একটা চড় মেরেছে মেয়ের গালে। স্তব্ধ হয়ে বিস্মিত চাওনি মেলে দেখছে সীমা। হঠাৎ কি চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

অনুতোষও চমকে ওঠে—কি করছো অণিমা!

অণিমা বলে—এতবড় সাহস ওর! এত জেদ!

অনুতোষ মেয়েকে বুকে টেনে নেয়। দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে উপরে নিয়ে যায়, ফুঁপিয়ে কাঁদছে সীমা। অনুতোষ ওকে থামাবার চেষ্টা করে।

—লক্ষ্মী মেয়ে। মাকে খুব বকে দেব!

সীমা বাবার শান্ত নির্ভয়ে যেন সান্ত্বনা খুঁজে পায়। মায়ের ওই কঠিন মূর্তিটা চকিতের জন্য তার মনে একটি কঠিন রেখায় ফুটে থাকে।

রাত নেমেছে। সীমা বাবার কাছে আজ তার মনের গহনের সেই প্রশ্নটাই তুলেছে। সীমা বলে।

—আমারও দাদু-দিদা জেঠু-জেঠিমা সব আছে বাপি, তবে তারা কেন আসে না?

অনুতোষ চমকে ওঠে সীমার কথায়।

অণিমা ওপাশে বসে একটা স্কার্ফ বুনছিল, সীমার প্রশ্নে সেও চাইল মেয়ের দিকে!

তার মুখে চোখে ফুটে ওঠে বিবর্ণতার ছায়া। অনুতোষ বলে।

—দাদু দিদার বয়স হয়েছে তো! তাই বেরুতে পারেন না।

সীমা বলে—তাহলে আমরাই যাই একদিন। বুঝলে বাপি—ইরার দাদু, শুভার ঠাকুমা সবাই স্কুলে আসে। আমাকেও কতো আদর করে ওরা। ওদের বাড়ি যেতে বলেছে শুভার জন্মদিনে!

অনুতোষও কথাটা ভেবেছে। বুঝেছে সীমার মনের নিঃসঙ্গতাকে। অনুতোষও ভেবেছিল সীমাকে মা-বাবা দেখতে চাইবেন। কিন্তু ওরা ও এড়িয়ে গেছে। একদিকে সীমাকেও তারা বঞ্চিত করেছেন।

অণিমাও জানে সেটা। সীমা—তার মেয়েতো ওদের কাছে কোন অপরাধ করে নি। কিন্তু তাকেও ওরা তাদের এতটুকু স্নেহের কোন স্বীকৃতি দেয় নি।

সীমাকে অনুতোষ বলে—তোমার জন্মদিনেও ওদের নেমন্তন্ন করবে। আর তো দেরী নেই। এর মধ্যে সামনের রবিবার যাবো ডায়মণ্ডহারবার, তারপর চিড়িয়াখানা তারপর জন্মদিন, তারপরই দিদার কাছে নিয়ে যাবো।

সীমা কি যেন স্বপ্ন দেখছে—ঠিক তো! দাদু-দিদা খুব খুশী হবে, আদর করবে, না?

অণিমা মেয়ের কথায় বলে—সীমা রাত হয়েছে। কাল সকালে স্কুল। যাও, শোও গে! গুড্ নাইট করো বাবাকে।

সীমার ওই স্বপ্নেও মা যেন বাধা দিয়েছে। সীমা মুখ কালো করে উঠে চলে গেল। অনুতোষ চাইল অণিমার দিকে।

—অণিমা!

দুজনে যেন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে। অণিমা বলে।

—সীমার মনে ওই মিথ্যা স্বপ্ন জাল বুনে লাভ কি; ওরা তাকে সইতে পারবে না। হয়তো দুঃখই দেবে। যে দুঃখের ভার আমরা বইছি, ওর জীবনে সেটাকে আনা কেন?

অনুতোষও ভেবেছে কথাটা। সীমা যে একদিন এ প্রশ্ন তুলবে

আর এটা বড় হয়ে উঠবে তার সামনে এ জানতো। সেই বুঝে অনুতোষ বলে।

—আমারও ভয় হয় অণিমা! তাই ওকে দুঃখ দিতে চাই না। আজ তুমি ওকে যেভাবে মেরেছো তাতে আমিও দুঃখ পাই! আজ তাই ওকে কাছে টেনে ওর দুঃখ ভোলাবার জন্য বলেছি ওকথা।

—মেয়ে এত জেদী হবে কেন?

হাসে অনুতোষ—তবু সয়ে নিতে হবে অণিমা। আমি যদি না থাকি সেদিন এ দায়িত্ব সবটুকুই নিতে হবে তোমায়। ওকে দুঃখ দিও না।

অণিমা বলে ওঠে—থামো তুমি। তোমার যতো আজে বাজে কথা। তুমিই আদর দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছো।

অনুতোষ শোনায়।

—এতবড় পৃথিবীতে সকলেরই সবাই থাকে। আমরা ছাড়া ওর আর কে আছে বলো?

দুজনে এই কঠিন সত্যটাকে বার বার উপলব্ধি করেছে এই শূন্যতার মাঝে। এ যেন তাদের কাছে নোতুন আবিষ্কার। অণিমাও চুপ করে ভাবছে কথাটা।

একটা কঠিন দায়িত্বের মুখোমুখি হয়েছে সে সন্তানকে কেন্দ্র করে।

সীমার কাছে এ এক নোতুন জগৎ।

কলকাতার বন্দীজীবন থেকে সে একদিনের জন্য এখানে এসে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বিরাট নদীর কিনারে ঢেউ ফুঁসছে, গাং চিলের দল ডানা মেলে নদীর বুকে ছোঁ দেয়, পাল তুলে হারিয়ে যায় নৌকাগুলো কোন অসীমে।

নদীর ধারে ঝাউবনে হাওয়া কাঁপে। সীমা ওই সবুজ গহণে কোথায় হারিয়ে যায়। গানের সুর ওঠে।

অনুতোষ অণিমা এসেছে ডায়মণ্ডহারবারে বেড়াতে সীমাকে নিয়ে। সীমা কলরব করে।

—মা মণি জাহাজ! ঐই যে।

নীল জল কেটে একটা জাহাজ চলেছে, নদীর বুকে তুফান জাগে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সীমা। ওই বিচিত্র জগতে সে হারিয়ে যায়। তার গানের সুর ওঠে।

অনুতোষ দেখছে তার মেয়েকে!

এ যেন অন্য সীমা। মাথার চুলগুলো উড়ছে। উড়ছে হাওয়ায় ওর নীল ফ্রক, বো। অণিমা ডাকে—বেশী দূরে যেওনা সীমা! খাবার সময় হয়েছে।

সীমা মায়ের দিকে চেয়ে দেখছে।

ডাক দেয় সে—বাপি!

অনুতোষও দৌড়াচ্ছে ওর সঙ্গে। সীমা হাসছে, ওর কলকণ্ঠ শোনা যায়।

বাবা মেয়ের ওই খেলায় সঙ্গী হয়েছে অণিমা!

ঝাউবনের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে অনুতোষ, সীমা। সীমা ওই সবুজ বনের মধ্যে খুঁজছে বাবাকে। অনুতোষ কোথায় হারিয়ে গেছে।

—বাপি!

সাড়া নেই! সীমা ভয় পায় সবুজ নির্জনে!

হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে সামনে বের হয়ে আসছে অনুতোষ। দুহাত দিয়ে সীমা বাবাকে জড়িয়ে ধরে—উঃ কি ভয় না হয়েছিল।

—যদি হারিয়ে যাই সীমা? অনুতোষ বলে।

সীমা বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে—যেতে দিলেই তো! আমি তোমায় ঠিক খুঁজে বের করবোই।

অণিমা মেয়েকে দেখছে। দুহাত দিয়ে যেন সীমা সবকিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

অণিমা বলে—চলো, খাবে না? খাবার সময় হয়ে গেছে।

টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার বের করছে অণিমা।

সীমার খাবারেও মন নেই, এই সুন্দর পৃথিবীর অপরূপ রূপের দিকে সে চেয়ে থাকে।

বলে সীমা—আবার এখানে আসাবো বাপি ? আসবে তো ?

অনুতোষ ঘাড় নাড়ে। পেন্সিলকাটা ছুরি দিয়ে সীমা একটা ঝাউগাছের গুঁড়িতে নিজের নাম আর নীচে বাবা এই দুটো কথা খোদাই করে চলেছে।

অনুতোষ বলে—কি হচ্ছে ?

হাসে সীমা—নাম লিখে গেলাম। আবার এলে দেখবো গাছটা কতো বড় হয়েছে। আর আমাদের নামগুলো মুছে যায় কিনা!

বৈকাল নামছে। সূর্যের চকলেট রং-এর আভা পড়ছে নদীর জলে। ওপারে দূরে কালো ছায়া ছায়া গ্রামরেখা আঁধারে ডুবে আসে। অণিমা তাড়া দেয়।

—চলো, ফিরতে হবে না ?

একটি সোনাঝরা দিন সব স্মৃতি নিয়ে সীমার মনের পরতে আসন পাতে।

ফিরছে ওরা কলকাতার দিকে।

অণিমার মনে হয় এই ছুটির দিনটি কোন দিকে কেটে যায়। মনে পড়ে কাল থেকে আবার কাজের চাপের কথা। কলকাতার জীবনের কাঠিণ্যটা মনের সব সুরটিকে চাপা দিয়ে রাখে। আজ সেটাকে আবিষ্কার করেছে সে-ও।

সীমার মন থেকে দাদু দিদা তাদের হারানো সংসারের ছায়াটুকুকে মুছে দেবার জন্যই ওরা গেছল। সীমা ফিরে এসে নীলেশকে তখনও বর্ণনা করে চলছে তার বেড়ানোর স্মৃতি।

সেই নদী জাহাজ ঝাউবনের গল্প!

নীলেশ যেন ওর মুগ্ধ শ্রোতা। নীলেশ বলে।

—ঠিক আছে। আজই ওটা লিখে ফ্যাল আর একটা কবিতাও। তোর জন্মদিনের উৎসবে ওটা পড়া হবে।

সীমা ভাবছে তার জন্মদিনের কথা। নাচ গান-এর কিছু আয়োজন করতে হবে। সীমা বলে—ইরা-শোভা আমরা মিলে একটা ছোট নাটক করছি মামা। একটু ষ্টেজ হবে না ?

নীলেশের কাছেই ওর এসবের জন্য বায়না। নীলেশ বলে।

—তা করতেই হবে। সিওর। আজ আসুক অনুদা—সব প্রোগ্রাম করেছি। আর গান ফান তো জানিনা। ওর জন্যে তোর জননীকে ধর দুচারদিন রিহার্সেল দিতে হবে তো!

সীমা বিজ্ঞের মত বলে—তাতো দিতেই হবে। তুমিও একটু বলো না মা-কে। তা নইলে মা-তো ধমকে উঠবে।

হাসে নীলেশ—মা-কে তাহলে ভয় করিস বল! তা ভালো।

অনুতোষ তখন ঠিক বুঝতে পারে নি মনোহর বাবুর তার সঙ্গে কথা বলার কারণটা। তার টেবিলেই ফাইলগুলো আসে দেখেশুনে অনুতোষ এবার ওই করিতকর্মা ব্যক্তিটির প্রকৃত স্বরূপ কিছুটা বুঝেছে। তার ট্রাকে মালপত্রের মধ্যে নিষিদ্ধ অনেক জিনিষই পাচার করা হয়। আর এসব তার জ্ঞাত সারেই হয়ে থাকে অবশ্য মনোহরবাবু জানিয়েছেন—তার অজ্ঞাতেই ড্রাইভার খালাসীরা পথে এসব মাল তোলে।...তার গুদামে হানা দিয়েও প্যাকেট কিছু পাওয়া গেছে, প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের বিখ্যাত গঞ্জিকা

মনোহর বাবুকে দেখে তাই একটু গম্ভীর হয় অনুতোষ। অণিমার কথাগুলো মনে পড়ে। সেবার ওর জন্যই তাদের সব ছেড়ে আসতে হয়েছে। মনোহর বাবু বলেন।

—ভালো আছো তো অনুতোষ? মেয়ে কেমন আছে?

—ভালোই!

মনোহর কথাটা পাড়বার জন্য উসখুস করে। বলে সে।

—একটু বিশেষ কাজে এসেছিলাম তোমার কাছে। আমার মাল-এর লরিতে কি সব ধরেছে পুলিশ! পথে বের হয়ে ড্রাইভার ক্লিনার যদি কিছু তোলে আমি কি করে জানবো বলো?

অনুতোষ বলে—আর পুলিশ গুদামে ওগুলো পেল মালের মধ্যে এ-সবও কি ওই ড্রাইভার ক্লিনারের কাজ!

মনোহর গুম হয়ে যায়। অনুতোষ বলে।

—আপনার কেস ডেপুটি কমিশনার নিজে টেক আপ্ করেছেন। ওকেই গিয়ে বলুন গে।

অনুতোষের কথায় মনোহর কঠিন দৃষ্টিতে চাইল। এবার সত্যিই জড়িয়ে পড়েছে সে। ব্যাঙ্ক দুটো কারখানা সিল করিয়েছে কোর্ট থেকে। তবু এই ট্রান্সপোর্ট-এর কারবারে কিছু হচ্ছিল, তাও যেতে বসেছে।

তাকে নিয়েও টানাটানি করবে পুলিশ।

তাই বলে মনোহর—তাহলে কেসটা তুমিই সাহেবকে রেফার করলে। ঠিক আছে।

মনোহর চলে গেল ধীর পদক্ষেপে।

অনুতোষ ওকে দেখছে। লোকটা যেন সাপের চেয়েও ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে গেল তার দিকে।

অনুতোষ কাজে মন দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেন জানে না ওই মনোহরের গোলমত মুখখানাকে ভুলতে পারে না সে। মানুষের এই নিষ্ঠুর রূপটাকে প্রত্যক্ষ করে সে চমকে উঠেছে।

তবু বাড়িতে নীলেশের কথায় অনুতোষ সাড়া না দিয়ে পারে না। বলে সে—সীমার জন্মদিন তাহলে করা যাক ঘটা করেই।

অণিমাও সায় দেয়—ঠিক আছে।

নিমন্ত্রিতদের লিষ্টও হচ্ছে। অনুতোষ-এর অপিসের ওর সহকারী যতীনবাবুও বাদ যায় না। এ বাড়িতে আসে যতীনবাবু। অণিমার তরফ থেকেও দুচারজনকে বলতে হয়। অভিজিৎ বাবু, সবিতা এমনি কিছু অতিথিরা আসবে। আর বাকী সীমার বন্ধুরা তো রয়েছেই।

অনুতোষ বলে—এসব ঝামেলা তোমাকেই সামলাতে হবে নীলেশ।

নীলেশ জানায়—আর আপনি? বাঃ—আমার ঘাড়ে বন্দুক রেখে এই কাণ্ড।

অনুতোষ বলে—আরে বাবা তোমার দিদি, তুমি আছো আর নিতাইদা রয়েছে! ব্যাস সব হয়ে যাবে। আমি একটু অপিস বেরুবো তবে দেরী হবে না। জরুরী একটা কাজ সেরেই চলে আসবো।

ওদিকে গানের সুর ওঠে। ইরা-শোভা-মায়া আরও ক'জন বন্ধুকে নিয়ে সীমা গাইছে। ওদের যেন এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করতেই হবে।

তাই রিহার্সেলের পর ওরা নীলেশকে ঘিরেছে।

—স্টেজ আলো সব চাই কিন্তু, আর ফুলের গহনা।

নীলেশ বলে—সব হবে। সব হবে। ডেকরেটারকে বলেছি।

কে চীৎকার করে—লাইট, মাইক?

—হবে! তাও হবে!

ঘরখানা ওদের কলরবে ভরে ওঠে।

অণিমার কাছে এ এক নোতুন আনন্দের স্বাদ। একদল শিশুর মধ্যে এমনি করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সেও যেন তৃপ্তি পেতে চায়।

অনুতোষকে ঢুকতে দেখে চাইল অণিমা।

এদের কোলাহল ছেড়ে সে নিজেদের ঘরে চলে গেল!

অণিমাও দেখছে ওকে।

অনুতোষ কথাটা জানাতে চায় নি! এমন অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে অপিসে। তাদের কাজই এই ধরনের। কিন্তু এক্ষেত্রে ওই লোকটা যেন অনুতোষের মনে ঝড় তুলেছে।

—কি ব্যাপার বলোতো? এমন চুপচাপ।

অনুতোষের দিকে চাইল অণিমা। অণিমা এগিয়ে আসে।

অনুতোষ ব্যাপারটা না জানাবার জন্যই বলে,

—কই নাতো! কি আবার হবে?

—কি যেন বলতে চাওনা তুমি। এ্যাই কি ব্যাপার বল না? অণিমা এগিয়ে আসে।

অনুতোষ এমনি কথাচ্ছলে বলে—কিছু না। আজ মনোহরবাবু

এসেছিল তার কিসব মালপত্র পুলিস সিজ করেছে, বে-আইনী গাঁজা চালান-এর ব্যাপারে তাকে জড়িয়েছে, তাই।

অণিমা অবাক হয়—তাই নাকি! ওর গুণের ঘাট নেই! তাই দেখছি এখনও সে মামলা লড়ছে সব হারিয়েও!

অনুতোষ বলে—ওরা অমনিই। বাড়িতেও শুনি নানা ঝামেলা। বনিবনা নেই স্ত্রী ছেলের সঙ্গে।

অণিমা শোনায়—এসবে তুমি বাপু থেকোনা। সাংঘাতিক লোক। তোমাকে কিছু বলছিল নাকি?

অনুতোষ জানায়—এসেছিল, যদি কোনরকমে একটু হেল্প করতে পারি ওকে। তা ওকে জানিয়ে দিয়েছি এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।

অণিমা কি ভাবছে।

ওই শয়তান লোকটা যেন বার বার তাদের জীবনেই কোন অশুভ ছায়ার মত এসে পড়েছে। একবার চরম আঘাত দিয়েছে, আবার কি মতলবে ঘুরছে কে জানে।

অণিমা বলে—একটু সাবধানে থেকো!

হাসে অনুতোষ—ছাড়োতো ওসব কথা।

সেও মন থেকে এই বাজে ভাবনাগুলোকে মুছে ফেলতে চায়। তাই বলে অনুতোষ—চলো। ওরা কি করেছে দেখি। নীলেশতো বেশ ক্ষেপিয়ে তুলেছে ওদের। এখন ওকেই সামলাতে বলো এইবার সীমাদের অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা।

এ যেন সত্যিকার কি এক বিরাট অনুষ্ঠান হতে চলেছে। অণিমা অপিস যায়নি। ব্যস্ত রয়েছে সকাল থেকেই। আর নীলেশের সময় নেই। বড় ডাইনিং স্পেসটায় জিনিষপত্র সরিয়ে ষ্টেজও তৈরী হয়েছে। ফুল রঙীণ কাগজ দিয়ে সাজানো হচ্ছে, খাবারের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত।

অনুতোষকে বের হতে দেখে নীলেশ এগিয়ে আসে।

—অপিস যাচ্ছেন সত্যিই! বেশ লোক মশাই আপনি, আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে নিজে কাটছেন?

হাসে অনুতোষ—ফিরে আসবো ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। সীমা তোমার জন্মদিনের উৎসবে থাকবো না একটা কথা! আসছি সীমা, তোমরা তৈরী হও।

অণিমাও মনে করিয়ে দেয়।

—দেরী করোনা কিন্তু। অনুতোষ বের হয়ে যায়।

দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামছে।

তখনও ফেরেনি অনুতোষ। অনুষ্ঠানেরও দেরী নেই। সীমারা গানগুলোর শেষ মহড়া দিচ্ছে। অণিমা অভিজিৎকে আসতে দেখে চাইল।

—এসো।

অভিজিৎ হাতের বড় প্যাকেট আর কিছু ফুল এগিয়ে দেয় সীমার দিকে, বলে সে—মিঃ বোস ইভনিং ফ্লাইটে বোম্বে যাচ্ছেন। এয়ারপোর্টে যেতে হবে, সময় পাবো না। তাই এখুনিই এলাম। সীমা—

সীমা হাত পেতে নেয়।

অণিমা বলে—নমস্কার করো কাকুকে!

—থাক-থাক! অভিজিৎ ওকে কাছে টেনে নেয়।

সীমা এ বাড়িতে এর আগে দু'একবার দেখেছে অভিজিৎকে। তাই চেনে। বলে সীমা—থ্যাঙ্ক ইউ আংকেল।

অণিমা শোনায়—এখুনিই যাবে না অভিজিৎ। অন্ততঃ এককাপ কফি স্যাণ্ডুইচ খেয়ে যেতে হবে। নিতাইদা—

নিতাই দৌড়লো কফি বানাতে।

অভিজিৎও এদের গানের সুরে যেন তৃপ্তি পায়। জমে উঠেছে ওদের গান। অণিমাও গলা মিলিয়ে গাইছে, কচি গলার ভিড়ে তার গলাটা মিশে গেছে! নীলেশও তাল দিয়ে চলেছে গানের ফাঁকে ফাঁকে। সুরের আনন্দ মুখর একটি ঘরোয়া পরিবেশে সুর ওদের নাচ-এর ছন্দ মিশে অন্য জগৎ গড়ে উঠেছে।

হঠাৎ অণিমা দরজার সামনে অনুতোষের অপিসের যতীন বাবু, আরও দু একজনকে দেখে অবাক হয়। ওদের জামায় রক্তের দাগ।

—যতীন বাবু। কি যেন একটা আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে অণিমা।

যতীনবাবু বলেন—অনুতোষবাবু বাড়ি ফেরার পথে একটা ট্রাক ওকে চাপা দিয়েছে এখুনি একবার হাসপাতালে চলুন আপনি।

সব সুর ছন্দ থেমে গেছে নিমেষের মধ্যে। সারা ঘরে স্তব্ধতা নামে। আর্তনাদ করে ওঠে অণিমা।

—উনি হাসপাতালে? কেমন আছেন?

যতীনবাবু বলেন—চলুন। দেরী করবেন না।

অভিজিৎও শুনেছে সব। এ অবস্থায় সেও বেরুতে পারে না। বলে সে—নীলেশ বাবু, মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে আসুন। আমার গাড়িতেই হাসপাতালে যাবো। আসুন—

ওই ফুলের সাজ, গানের সুর—আলোভরা হলটায় নামে নিবিড় স্তব্ধতা। সীমার এই উৎসাহ পরিণত হয়েছে কি নিদারুণ এক ব্যর্থতায়, বেদনার কঠিন বাস্তব রূপে।

অনুতোষকে চেনা যায় না।

কি নিষ্ঠুর আঘাতে ওর সর্বাঙ্গ পিষে দিয়েছে নির্দয়ভাবে ওই ট্রাকটা। তার জ্ঞানও ফেরেনি। অণিমা কি বেদনায় গুমরে ওঠে।

অভিজিৎও এসেছে। যতীনবাবুও সঙ্গেই আসছিল একটু পিছনে। কোথা থেকে ওই বিরাট ট্রাকটা তেড়ে এল, হর্নও দেয়নি। একেবারে যেন ওকে চাপা দেবার জন্যই এগিয়ে আসছে, চীৎকার করে যতীনবাবু —স্যার; ট্রাক।'

সরে যাবারও চেষ্টা করেছিল অভিজিৎ। কিন্তু ট্রাকটা একটা চাকা ফুটপাথে তুলে এদিকে এসে ওকে নীচে ফেলে দলে পিষে সোজা বের হয়ে কোন দিকে চলে গেল।

যতীনবাবু বলে—পিছনে নাম্বার প্লেটটার লেখাগুলোও তেমন পড়া যায় নি। ইচ্ছে করেই সেটাকে বিকৃত করে এনেছিল ওরা বোধহয়।

চমকে ওঠে অণিমা!

অনুতোষ কি বলার চেষ্টা করছে অণিমার মনে পড়ে মনোহর-বাবুর সঙ্গে ওর গোলমালের কথাটা। বলে ওঠে অণিমা,

—মনে হয় মনোহরবাবুরই ষড়যন্ত্র এসব নীলু! ওর কেসটাকে চাপতে বলেছিল ওকে—করেনি। তাই আবার এই সর্বনাশ করে গেছে ওই-ই।

অনুতোষ কি বলার চেষ্টা করে।

ডাক্তার বাধা দেয়—প্লিজ। পেসেন্টকে এখন শান্তিতে থাকতে দিন।

সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ, চোখ-টা শুধু দেখা যায়। অক্সিজেন চলছে।

···তবু অনুতোষ দেখছে ওকে।

ওর চোখে সীমা আর অণিমার মুখদুটো স্পষ্টতর হতে হতে কেমন ঝাপসা হয়ে অতল অন্ধকারে ডুবে যায়।

অনুতোষকে ওরাই শেষ করেছে!···

আর্তনাদ করে ওঠে অণিমা। কি অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। সীমা ভাবতেই পারেনি ব্যাপারটা। সে যেন বিশ্বাসই করে না। মায়ের কান্নায় সেও এবার ভেঙ্গে পড়ে!

তাদের সব হারিয়ে গেল।

অভিজিৎ বলে—মিসেস চ্যাটার্জি। এসময় আপনি এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

সীমার কান্না ভেজা চোখের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে অণিমা। ওর আজ কেউ নেই। ওর দুনিয়াটা যেন শূন্য হয়ে গেছে কি নিষ্ঠুর আঘাতে। একটা অদৃশ্য হাত অণিমার জীবনে বার বার এমনি ভাবে সব কেড়ে নিতে চেয়েছে।

তবু বাঁচতে হবে তাকে। অণিমা মাথা নোয়াবে না। আজকের

সমাজের কঠিন আবর্তে সেও মাথা তুলে সব দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে। শক্ত হতে হবে তাকে।

অনুতোষ নেই! সীমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে অণিমা।

—আমি ঠিক আছি অভিজিৎ! এ আমাকে সইতেই হবে! আমি যে মা।

সীমা মায়ের বুকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোথাও যেন কোন আশ্বাস তার নেই। দুটি মেয়ে সমাজের কঠিন নির্মম আঘাতে আজ মুষড়ে পড়ে। নীলেশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ তার কাছেও এই মৃত্যু কি চরম বিপর্যয় এনেছে।

খবরটা মনোহর পেয়েছে!

বড় বাড়ির একদিকে নীচতলায় তার অফিস। এদিকে কেউ বড় একটা আসে না। প্রকাশ্য অফিসটা সামনের দিকে। মনোহর দত্ত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওদিকে হঠাৎ কিসের শব্দে চাইল!

ঢুকছে লোকটা! মনোহর এগিয়ে আসে। শুধোয় সে চাপাস্বরে,

—কি খবর?

লোকটা জানায়—খতম।

—ব্যস! কেউ টের পায়নি তো? নাম্বার টাম্বার লেখেনি?

লোকটা জানায়—নাম্বার প্লেট তাও আবছা, কে কি লিখবে স্যার!

একেবারে ক্লিন টার্ন ওভার করে গাড়ি সিধে ধাপায় নিয়ে গিয়ে ধুয়ে মুছে সবজীর ক্ষেপ বইছে।

মনোহর কিছু টাকা দিয়ে বলে—যা।

ওর চোখে মুখে এবার ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি। তার সর্বনাশ করার আগেই মনোহর দত্তই এমন দুচারজনকে সিধে করেছে।

—কে?

তারই ছেলে ওদিকের বাগানে বল খেলছিল, বলটা এদিকে আসতে সে কুড়োতে এসেছিল, হঠাৎ খোলা জানলার সামনে এসে ওদের চাপাস্বরের রহস্যময় খতমের কথা শুনে চমকে উঠেছে সে!

চমকে ওঠে মনোহর—এখানে কি করছিস ?

ছেলেটা বলল—বল কুড়োতে এসেছিলাম।

মনোহর ধমকে ওঠে—বল খেলা ! পড়াশোনা নেই। যা—এখান থেকে।

ছেলেটা বাবার ধমক খেয়ে ওখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এল। তবু ওর কিশোর মনে একটা কি নিষ্ঠুর আতঙ্কের ছবি ফুটে ওঠে।

দেখছে সে তার বাবাকে।

কেমন ভয় ভয় করে। ছেলেটাও দেখেছে পুলিস এসেছিল সেদিন।

বাবার ওই লোকগুলো কেমন ! সব মিলিয়ে একটি কিশোরও ভয় পায় ওকে, হয়তো ঘৃণা করে বাবা নামক ওই বিচিত্র মানুষটিকে।

মনোহর এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। এবার হয়তো ফাইলটাকে ম্যানেজ করতে পারবে সে। যে ভাবে হোক তাকে বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে। মনোহর পরের পথগুলোর কথা ভাবছে।

সরসীবাবুদের কাছে ও খবরটা দিয়েছিল নীলেশ। অনিমা চায় নি। তবু নীলেশ বলে—জানানো দরকার।

প্রাণতোষ এসেছিল শ্মশানে। বাবার বয়স হয়েছে তাকে আনেনি সে। অণিমার দিকে চেয়েছিল প্রাণতোষ। নিরাভরণা মূর্তি, পাশে কাঁদছে সীমা। পরিচয় করারও সময় হয় নি।

প্রাণতোষের চাহনিতে শোক নয় কি জ্বালা ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে অভিযোগই। এ সবকিছুর জন্য অণিমাই যেন দায়ী।

সব শেষ হয়ে গেল।

অণিমা কোন সান্ত্বনার কথা, কোন আশ্বাসও পায় নি ওদের কাছ থেকে। চিতার নিভু নিভু আগুন কলসীর জলে নিভিয়ে দিয়ে বসুমতীকে শীতলাকরে সেই আগুনের জ্বালা বুকে নিয়ে ফিরে এল অণিমা নিজের ঘরে।

এবার অভিজিৎ-এর ছুটি মেলে এসব শেষ হবার পর।

—আমি আসি মিসেস চ্যাটার্জি।

কথার জবাব দেবার সাধ্যও যেন অনিমার নেই। মাথা নেড়ে সায় দিল মাত্র। তবু অভিজিতের কাছে সে কৃতজ্ঞ। আজ অনেক করেছে সে, নইলে একা নীলেশ সবদিক সামলাতে পারতো না।

ছত্রভঙ্গ অবস্থা—হলে তখনও ফুলের সাজ, এসব যেন অণিমাকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করছে। বলে ওঠে সে—ওসব খুলে ফেলে দাও নিতাই দা। ও আমি দেখতে পারছি না।

মনোহরবাবু পরদিনই ওবাড়িতে গিয়েছে পরম হিতৈষী বন্ধুর মত। সরসীবাবু চুপ করে বসে আছেন। মনোহরকে দেখে সরমা কেঁদে ওঠে।

—কি হল ঠাকুপো? এমনি করে সর্বনাশ হয়ে গেল। শিবুও বিলেতে—প্রাণতোষ একা কতো সইবে! তার ওপর ওই মানুষটা শোকে যেন পাথর হয়ে গেছে।

মনোহর দেখছে ওদের। সেও অশেষ দুঃখ পেয়েছে। তাই সমবেদনার সুরে বলে—সবই সইতে হবে সরসীদা। কি করবে বলো।

সরসীবাবু এ আঘাতকে সইবার চেষ্টা করেন। বলেন তিনি,

—ওই মেয়েটির জন্যই এ সর্বনাশ হ'ল মনোহর। আমি প্রথম থেকেই বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে, নিয়তিকে কেউ রুখতে পারবে না।

মনোহরবাবু অশ্রু সজল চোখে মাথা নাড়ে।

আজ সেও এই পরিবারের দুঃখে সমদুঃখী এই অভিনয়টা সুন্দর ভাবেই করে তোলে। বলে সে,

—এবার মা মেয়েতে একা রইল, দেখাশোনার দায়িত্বও তো এল বৌঠান।

সরমা তীব্রস্বরে বলে—আর সম্বন্ধ কি ঠাকুরপো। এমন ছেলেকে

হারালাম আর তাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক আমার। তাদের দেখাশোনার জন্য লোকের অভাব হবে না। ও মেয়ের বরাতে আর কি আছে তাই ছাখো।

মনোহরবাবু তবু যেন উস্‌কে দিতে চায় আগুণটা। বলে সে,

—তবু তো সে এ বাড়ির নাতনি!

এ বিষয়ে কারোও কোন উৎসাহ নাই দেখে মনোহর মনে মনে খুশীই হয়েছে।

বৈকাল নামছে। মনোহর বলে,

—আজ চলি সরসীদা। খবরটা শুনে থাকতে পারলাম না, আহা—কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলাম, তাই দৌড়ে এলাম। উঠি আজ।

বের হয়ে এল মনোহর।

সরমাও কথাটা ভাবছে।

এরপর তাদের পারলৌকিক কাজ কম্মো আছে। সুতপা বলে,

—ওদের কেউ আসার আগে আমাদের একবার গিয়ে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা দরকার মা! নইলে যদি এসেপড়ে হুটকরে মা মেয়েতে—

সরমা ভাবছে কথাটা। সুতপা আজ চায়না ওরা এসে এখানে কোন ঝামেলা করুক। প্রাণতোষকে কথাটা জানিয়েছিল সে। সরমা চুপ করে কি ভাবছে, মায়ের মন এতটা কঠিন হতে হয়তো বাধে। সুতপা বলে,

—নাহয় একবার এসময় গিয়ে দেখাই করবেন। যা বলার তখন বলা যাবে।

অণিমা চুপচাপ বসে আছে। সারা বাড়িটায় স্তব্ধতা নেমেছে। ক'দিনেই এদের জীবনযাত্রার সেই ধারাটা বদলে গেছে। কোথাও কোন সাড়া নেই। সীমার হাসি, গান থেমে গেছে। সেও বুঝেছে তাদের জীবনে এসেছে চরম একটি বিপর্যয়।

নীলেশ এসেছে, নীলেশ বলে—দিনরাত এভাবে বসে থাকলে চলবে ? তুই যে পাথর হয়ে গেলি দিদি !

হঠাৎ সিঁড়িতে ওদের দেখে অবাক হয় সে।

সরমা সুতপা করবী আসছে। অণিমা এগিয়ে যায়।

—আসুন মা।

সরমা দেখছে এ বাড়ির এদিক ওদিক। ঠাটবাট মন্দ নয়। ভালোই ছিল ওরা। এইভাবে থাকার জন্যই সংসার থেকে অণিমা অনুতোষকে বের করে এনেছিল।

সরমা বলে—অশৌচ অবস্থা। এখন পেন্নাম-টেন্নাম করোনা বাপু।

অণিমা সীমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—এই ঠাকুমা জেঠিমা —পিসী।

সরমার কাছে এই পরিচয় দেওয়াটা যেন ব্যঙ্গেরই মত ঠেকে।

সরমা বলে—থাক বাছা পরিচয় আর হতে দিলে কই ? আর পরিচয়ে কি দরকার বলো। অচেনাই থাক।

সীমা দেখছে ওদের।

ঠাকুমা—জেঠিমা এদের সম্বন্ধে তার কিশোর মনে একটা ধারণা, একটা ছবি গড়ে উঠেছিল স্নেহময়ী রূপ নিয়ে, একদিন নিশ্চয়ই যেতো সে কিন্তু আজ ওদের বাস্তবে যে রূপ দেখেছে তাতে চমকে উঠছে সীমা। স্বপ্নের সঙ্গে এই বাস্তবের কোন মিল নেই। মনের সেই সুর খান্ খান্ হয়ে গেছে কি নিষ্ঠুর আঘাতে।

সুতপাই কথাটা পাড়ে—সেজো, ওর তো শেষ কাজকম্মো করতে হবে।

অণিমা দেখছিল ওদের।

সীমার এতবড় দুঃখে ওরা কেউ তাকে কাছে ডেকেও এতটুকু সমবেদনা জানায়নি। আদরও করেনি। অবজ্ঞায় অনাদরে সীমাকে ওরা এই অবস্থায় আঘাত দিতেও দ্বিধা করেনি।

অণিমা চুপকরে সহ্য করে এই আঘাতটা। সুতপাই কথাটা

বলে চলেছে—তাই কাজ-এর ব্যবস্থা এখানেই করবে তো? মানে ওবাড়িতে তোমার এই অবস্থা দেখলে বাবার কিছু না হয়ে যায় হাই প্রেসার, ওইসব শুনেতো মুষড়ে পড়েছেন, তাই বলছিলাম এখানে করাই ভালো ঠাকুরপোর শেষ কাজ।

নীলেশ শুনছে ওদের কথাগুলো।

সে দেখছে ওদের ব্যবহারটাও। অণিমা সব শুনে বলে,

—এখানেই করছি দিদি। এ নিয়ে তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।

সুতপা খবরটায় খুশী হয় মনে মনে, তবে ওর কথার সুরটা সুতপাকে আঘাতই করেছে। সরমাও অণিমার কথার ঝালটা অনুভব করে বলে,

—ভাবতে তো দাওনি বাছা। সবতো চুকিয়েই দিলে আমার অনুকে হারালাম—আর ভাবার কি আছে!

সুতপা জানায়,

—চলুন মা। বাবাকে অনেকক্ষণ একা রেখে এসেছি।

অণিমা ওদের এগিয়ে দিয়ে আসে নীচে অবধি। নীলেশ চুপকরে বসে সব শুনছে, অণিমা উঠে আসতে বলে সে,

—এরাই তোর আপনজন না রে দিদি? মানুষ না আর কিছু

অণিমা সীমাকে কাছে টেনে নেয়। সীমা বলে,

—এদের না চেনাই, না দেখাই ভালোছিল মা! ঠাকুমা এই আমার ঠাকুমা—জেঠিমা?

সীমা অসহায় কান্নায় গুমরে ওঠে। অণিমা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে,

—কাঁদছিস কেন সীমা। ওরে কেউ না থাক তোর নীলু মামা আছে, আমিতো আছি রে।

মা আজ মেয়েকে কি আশ্বাস দিতে চায়, বাঁচার আশ্বাস নিজেও যেন ওই মেয়েকে কেন্দ্র করেই নোতুন করে বাঁচতে চায় সবকিছু আঘাত সহ্য করে।

প্রবাহমান জীবনস্রোত, কাল এর সাক্ষী। একদিন জীবনে এই কাল এনেছিল পূর্ণতার সুর। আজ এই মহাকালই যেন নিষ্ঠুর হাতে সব কেড়ে নিয়েছে।

তবু জীবনের প্রবাহ থামেনি। সে নোতুন খাতে বইতে থাকে অন্তহীন পথে। সেই পথে কেউ হারিয়ে যায়, যারা থাকে তাদের চলতেই হবে। থামার উপায় নেই।

মিঃ বোস চুপকরে শুনেছেন অণিমার কথাগুলো। একটি মেয়েকে তিনি দেখেছেন ছেলেবেলা থেকে, দেখছেন ওর উপর একটার পর একটা আঘাতই এসেছে। আজ সব হারিয়ে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বাঁচার জন্য লড়াই করছে অণিমা।

মিঃ বোস বলেন—পুলিশ কোন খবরই বের করতে পারলো না গাড়িটার ?

মাথা নাড়ে অণিমা।

জানায় সে—মনে হয় মনোহরবাবুরই এসব কাজ। ওর ষ্টকে সব চালানের বেআইনি মাল ধরা পড়েছিল তাই শোধ নিয়েছে সে।

—সেই মনোহর দত্ত। এগেন !

অণিমা কি ভাবছে। মিঃ বোস বলেন,

—দিনকতক ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে এসো অণিমা। কিছুদিন কাজ থাক ! রেষ্ট নাও।

অভিজিৎও বলে,

—আমি আগেই বলেছিলাম ওঁকে !

অণিমা বলে—তবু কাজ-এর মধ্যে ডুবে থাকি সময়টা কেটে যায় কোনদিকে। এই ভালো।

মিঃ বোস চুপ করে থাকেন।

—যাই স্যার !

অণিমা উঠে এল। বেয়ারা বুড়ো মহেশও দিদিমণির দুঃখে দুঃখী। সে জানায়—আমারও এই হাল হ'ল দিদি। বৌটা মারা

গেল যখন মেয়েকে রেখে, ভাবলাম সব আঁধার হয়ে গেল। বাঁচবে কি নিয়ে? দিদি—দেখলাম ভগবান আছেন। দুঃখ যিনি দ্যান সে দুঃখ সইবার ক্ষমতাও দেন তিনি।

বৈকাল নামে।

অভিজিৎ এসে ঢোকে ওর চেম্বারে—বাড়ি ফিরতে হবে না?

খেয়াল হয় অণিমার। মনে পড়ে সীমার কথা। একা তাকে রেখে এসেছে। বের হয় দুজনে!

সীমা স্কুল থেকে ফিরে বসে আছে বাড়িতে।

বাসনা খাবার এনে দেয়, আজ চুপ করেই খায় সে। আগেকার সেই প্রতিবাদ জেদ নেই। বাসনা বলে—লক্ষ্মী মেয়ে।

—মা কখন ফিরবে?

সীমার কথায় বাসনা বলে—ফেরার সময় হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। স্তব্ধ বাড়িটায় বসে আছে সীমা। ঘরটা শূন্য—মনে পড়ে বাবার কথা। সীমার দুচোখ বেয়ে জল নামে কেউ নেই তাকে কাছে টেনে নেয়।

হঠাৎ অণিমা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো।

তাদের পায়ের শব্দও শোনেনি সীমা। তন্ময় হয়ে বাবার ছবিটার দিকে চেয়ে আছে আর কাঁদছে।

—সীমা!

অণিমা নিজেকেই যেন অপরাধী মনে করে। ওকে কাছে টেনে নেয় সে।

সীমা মাকে দেখে এগিয়ে এসে ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। বলে সে—এত দেরী করো কেন মা: একা একা বড় ভয় করে যে।

অণিমা বলে—দেরী আর হবে না মা। কাজে আটকে পড়েছিলাম। বসো অভিজিৎ।

অভিজিৎ দেখছে ওদের মা মেয়েকে।

সীমাকে কাছে ডাকে সে—এসো সীমা।

সীমা এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। অভিজিৎ বলে—চোখ মোছো। গুড্ গার্ল। একা একা সত্যি বোর লাগবে বইকি। চলো একদিন আমরা অনেক দূরে বেড়িয়ে আসবো। কেমন?

মাথা নাড়ে সীমা।

এই বদ্ধ দেওয়ালের মধ্যে থেকে সেও মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

রাত্রি হয়েছে। অভিজিৎ চলে গেছে।

মা মেয়ের এই জগতে ওরা দুজনে যেন দুজনকে ফিরে পায়। এই তাদের একটি সুখের নীড়, অনেক স্বপ্ন মাধুর্য ভরা এইটুকু বাঁচার আশ্বাস নিয়েই তারা দিন কাটায়। দুটি নারী।

দুজনে দুজনের শূন্যতাকে পূর্ণ করে তুলেছে।

তাই দিন কাটানো সহজ হয় ওদের পক্ষে।

দিন মাস পার হয়ে বছর এসেছে। সীমাও এই দুঃখটাকে সয়ে নিয়েছে। স্কুলের পড়া শোনায় ভালোই সে, স্পোর্টস-এ প্রাইজ আনছে। তাছাড়া গানও রয়েছে। তরুণ মন—চোখে তার এগিয়ে যাবার স্বপ্ন, তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের গতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে সে।

অণিমাকে বাইরের কাজ নিয়ে ডুবে থাকতে হয়।

রুজিরোজকারের প্রশ্নটাও রয়েছে, রয়েছে টিকে থাকার প্রশ্ন। নিরলস শোক-এর ঠাঁই এখানে নেই।

বছর ঘুরে গেছে। অভিজিৎ এবাড়িতে আসে মাঝে মাঝে। সীমাও সহজ হয়ে গেছে তার কাছে। বেড়াতেও বের হয় দল বেঁধে।

সেদিন ওরা গেছে ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গার ধারে।

অভিজিৎ অণিমা বসে আছে ঝাউবনের ধারে, সীমা হঠাৎ চমকে ওঠে। ঝাউবন বালুবেলার ধারে এসে অবাক হয়, মনে পড়ে আগেকার সেই ছবিটা। বাবার সঙ্গে এসেছিল এখানে।

ওদিকে ঝাউগাছের গুঁড়িটাতে নজর পড়েছে।

কানে আসে ঝাউবনের সুর, নদীর ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ—দূরে আকাশ কাঁপিয়ে জাহাজের বাঁশী বাজছে এই সুর, এই ঠাঁই—সব তার চেনা, বাবার কথা মনে পড়ে।

মনে হয় সামনের ঝাউ-এর সবুজ বনভূমি ঠেলে উঠবে সেই হাসিভরা মানুষটি, ডাকবে তাকে!

গাছের গুড়িটায় হাত দিয়ে চমকে ওঠে সীমা।

বছর ঘুরে গেছে, গাছটা ঠেলে উঠেছে। ওর কাণ্ডে অনেক রোদ—নোনা হাওয়ার স্পর্শ—বৃষ্টির ধারা মাখানো। তবু সেই ছাল বাকল তুলে এঁকে রাখা তার সেদিনের লেখাটা রয়ে গেছে, বাবার নামটাও স্পষ্ট আর নেই। নোতুন বাকলে ঢেকে ম্লান বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সীমা চাইল মায়ের দিকে।

মা আর অভিজিৎ বসে আছে, কি কথা বলছে তন্ময় হয়ে!

—মা।

নোনা হাওয়ার দাপটে ওই ডাকটা মায়ের কানে পৌঁছে না। সীমা দেখছে এযেন নোতুন একটি মানুষকে।

সীমা মনে মনে ভয় পেয়েছে।

বাবার কণ্ঠস্বর যেন হাওয়ায় ভেসে আসে—ভেসে আসে তার হাসির শব্দ।

—বাবা। বাপি।

ডাকছে ব্যাকুল স্বরে একটি অসহায় মেয়ে, এই অরণ্যে সে যেন হারিয়ে গেছে। খুঁজছে এতটুকু আশ্রয়। কিন্তু কোন সাড়া নেই।

ঢেউ ভাঙ্গছে—ভাঙ্গনের শব্দ ওঠে। এই অরণ্যে—ওই অন্তহীন নদীর সামনে একা সীমা কোথায় হারিয়ে গেছে।

দু'চোখ ছেয়ে জল আসে।

—সীমা!

মায়ের ডাকে চাইল সে—কাঁদছিস কেন রে?

সীমা চুপ করে থাকে। জানাতে পারে না—এখানে এসে কি হয়েছে তার।

বলে সে—ফিরে চল মামণি!

অভিজিৎ বলে—এরই মধ্যেই, নৌকায় চড়বে না?

সীমা এখানের স্মৃতিটুকুকে অন্য কোন তৃপ্তি দিয়ে আজ মুছে ফেলতে চায় না। ওই অভিজিৎ যেন তাই চাইছে। কিশোরী সীমার কাছে এটা ভালো লাগে না।

বলে সে—না। এখান থেকে চলো মামণি!

হতাশ হয় অভিজিৎ!

অণিমা বলে—চলো, মেয়ের যা জিদ!

ওরা ফিরছে কলকাতার দিকে। চুপ করে বসে আছে সীমা। মা-অভিজিৎ-এর দিকে চাইছে সে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে। ভেবেছিল মা ওখানে মনে করবে সেই আগেকার দিনটির কথা। কিন্তু তা দেখেনি সীমা। বাবার কথা মা আজ ভুলে গেছে।

মায়ের এই বিস্মৃতিটা তার কিশোরী মনে প্রশ্ন তুলেছে। তারই উত্তরের সন্ধান করে সে মায়ের চোখে—তার কথায়, অভিজিৎ আর মায়ের হাসির মধ্যে।

বাড়ি ফিরে গাড়ি থেকে নেমে উপরে চলে যাচ্ছে সীমা।

অভিজিৎ বলে—ওর কি শরীর খারাপ মিসেস চ্যাটার্জি?

অণিমা বলে—উঁহু। মাথা খারাপ। মেয়ের মাথায় মাঝে মাঝে পোকা নড়ে ওঠে।

হাসছে অভিজিৎ। অণিমা বলে—কফি খেয়ে যাও অভিজিৎ। এতখানি ড্রাইভ করেছো—একটু রেষ্ট নিয়ে যাও।

সীমা দেখল মাত্র। উঠে নিজের ঘরে চলে গেল সে। তার কিশোরী মনে আজ হঠাৎ কি যেন আবিষ্কার করেছে সে। মা-কে বারবার ডেকে সে দেখাতে চেয়েছিল বাবার হারানো চিহ্নটা, কিন্তু সেই পরিবেশে গিয়ে মা-ও বদলে গেছে। মায়ের একটি স্বতন্ত্র রূপ ফুটে উঠেছিল মেয়ের চোখে। নোতুন একটি রূপ, ওই অভিজিৎ-এর সামনে।

সীমার পড়াতেও মন বসে না। গুম হয়ে থাকে।

অভিজিৎ চলে গেছে।

অণিমা উপরে এসে সীমার ঘরে ঢুকে দাঁড়ালো। মেয়ের মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ নেমেছে। অণিমা বলে—পড়তে বসিস্ নি ?

সীমা বইটা টেনে নিল, একটা বই ছিটকে পড়ে টেবিল থেকে।

—কি হয়েছে তোর ?

সীমা জবাব দিল না।

অণিমা দেখছে মেয়েকে। মেয়ের এই একগুঁয়েমি ভাবটা এর আগেও দেখেছে সে। বাবা বেঁচে থাকতেও তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এমনি জিদ করেছে সীমা। অণিমা চড় চাপড়ও মেরেছে তখন। আজ মেয়ে বড় হচ্ছে, গায়ে হাত তুলতে চায়নি আর স্বামীর কথা মনে পড়ে। আজ সেও নেই। একাই তাকে ওর সবকিছু দায় বইতে হবে।

অণিমা বলে—কি রে ? শরীর খারাপ ?

সীমা জবাব দেয়—না।

পড়তে বসে সে। অণিমা বলে—এমনি করবি তো তোকে দেখছি হোষ্টেলেই পাঠাতে হবে। সেখানেই থাকবি।

চমকে ওঠে সীমা। তার কিশোর মনের ধারণা দ্বন্দ্ব বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। মনে হয় চীৎকার করে জবাব দেবে সীমা—তাই দাও। তুমিতো তাই চাও! আমাকে সরিয়ে দিয়ে এবার নিজের পথে চলতে চাও। তোমার কাছে আমি আজ বোঝা হয়ে উঠেছি।

কিন্তু বলতে পারে না।

বাবার কথা মনে পড়ে। আজ বাবা থাকলে মা একথা তাকে বলতে পারতো না। হঠাৎ সীমার বাবার সেই হাসিভরা মুখ, তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর মনে পড়ে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সীমা।

অণিমা অবাক হয়। মেয়ের মনের অতলের এই দ্বন্দ্বের কথা—তার মনের গহনের ভাবনার কথাগুলো জানতে পারে নি। তাই ওকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে দেখে অবাক হয় অণিমা। হয়তো বোর্ডিং-এ পাঠাবার কথাতেই কাঁদছে সে।

অণিমা মেয়েকে বলে—ভালো ভাবে থাকবে পড়াশোনা করবে। বুঝলে? কেঁদো না।

হঠাৎ হাসির শব্দে চাইল সীমা।

নীলেশ ঢুকছে। ওকে কাঁদতে দেখে নীলেশ বলে—আরে কাঁদছিস তুই? বেড়িয়ে ফিরে এসব কান্নাকাটি কেউ করে? কিরে দিদি, বকেছিস নাকি।

অণিমা ক্লান্ত স্বরে বলে—পড়াশোনা নেই, ভদ্রতা বোধ নেই। একটা বুনো গোঁয়ার হয়ে উঠছে। তাই বলেছি ওকে হোষ্টেলে পাঠিয়ে দেব।

—এই কথা। নীলেশ এগিয়ে এসে সীমার মুখটা তুলে বলে,

—ষ্টপ ক্রায়িং। তোর এসব অভিযোগ মিথ্যে, বেসলেস। সীমা পড়াশোনায় ব্রিলিয়াণ্ট। বেটার দ্যান মি। উইথ গুড ম্যানার্স। সীমা ইংরাজী গ্রামার বের কর। তুমি যাও তো দিদি নিজের ঘরে। মা মেয়েতে মাঝে মাঝে যা নাটক সুরু করেছো এখন দেখছি রবীন্দ্রসদনে আর যেতে হবে না। বাড়িতেই ব্যালকনিতে বসে নাটক দেখতে পাবো বিনিপয়সায়।

অণিমা ক্লান্ত স্বরে বলে,

— একজন ওকে মাথায় তুলে ওই করে গেছে, আর তুইও ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছিস। আমি এসব ভাল বুঝছি না রে।

জীবনে সমস্যাগুলো এমনি করেই গড়ে ওঠে।

জীবন যত জটিলতার মধ্য দিয়ে বয়ে চলে—আশপাশের অনেক সমস্যা ততই ঘনিয়ে আসে এসে পড়ে। সংসারের আসে পাশে জীবনের পথে পথে এগুলো ছড়ানো থাকে, জড়িয়ে পড়ে পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে।

অণিমার জীবনটা চিরাচরিত স্বামী-সংসার-ছেলেমেয়ে নিয়ে চলার পথ থেকে অন্যদিকে বয়ে গেছে। আজ সে একদিক থেকে নিঃস্ব। মনের একটা দিক তার শূন্য, নিঃসঙ্গ।

কঠিন জীবন কার্যে ঠাসা। বাঁচার জন্য খাটতে হয়, নিজের দিন

গুজরানের জন্য কোন সবুজ ঠাঁই নেই জীবনে, ছায়া তরু নেই সেখানে সব ক্লান্তির মাঝে একটু আশ্রয় পাবে সে। একাই জীবনে বোঝা বয়ে চলেছে একটি নারী। তাই সীমার এই মাথা তোলার চেষ্টা—প্রতিবাদগুলোয় মাঝে মাঝে অণিমা আরও রেগে ওঠে, বিব্রত বোধ করে। কোথাও আশ্বাস চায়। শান্তি পেতে চায় সে।

অভিজিৎ তাই এই ক'বছরেই তার অনেক কাছে এসে গেছে। দুজনেই সহজ স্বাভাবিকভাবে দিনের অনেক সময় কাছাকাছি থাকে। অভিজিৎ-এর সুন্দর সংযত সংবেদনশীল ব্যবহার অণিমার মনে একটা আশ্বাস এনেছে।

সেও অণিমার সংসারের ভালো মন্দের খবর রাখে।

সেদিন অণিমা বলে—মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি অভিজিৎ। মনে হয় একা একা সংসারের বোঝা টানতে পারছিনা। আমি ক্লান্ত, হয়তো হেরে যাচ্ছি।

অভিজিৎ ওর দিকে চাইল।

অফিসের কাজ বেড়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে। অণিমা অভিজিৎ দুজনে তবু ছুটির পর মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার আগে লেকের ধারে আসে। ছাতিম গুলমোর গাছের ফুলগন্ধ বাতাস জলের হাওয়া ওই সবুজ মুক্তির মাঝে অণিমা যেন অভিজিৎকে কি জানাতে চায়।

অভিজিৎও ক'বছরে তার অজানতেই ওই কঠিন সংগ্রামী মেয়েটির অনেক কাছে এসেছে। অণিমার শান্ত মুখে নিবিড় নিঃস্ব বেদনার ছায়া। অভিজিৎ বলে,

—তুমি এত ভাবো কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

অণিমা এই ভাবনাগুলোকে সরিয়ে ফেলতে পারে না।

দেখছে চারিদিকে বাঁচার কাঠিণ্যের মাঝেও সকলের জন্য সঙ্গী আছে, ঘর আছে, আছে ভালোবাসা ভরা পূর্ণতার আশ্বাস। তার জীবনে এসব কিছুই নেই।

অণিমা জানায়—মনে হয় যেন হেরে যাচ্ছি অভিজিৎ। একা এতবড় কঠিন দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে আর পারছি না। সীমার

জন্যও ভাবনা হয়। মেয়ে হয়েও এ সমাজে বাঁচার সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু—

অভিজিৎ শুনছে ওর কথাগুলো—অণিমা!

অণিমা চাইল ওর দিকে। অভিজিৎ কি যেন বলতে চায়। তার বলারও কিছু আছে। সে চায় ওই মেয়েটিকে বাঁচার সেই আশ্বাস দিতে।

অভিজিৎ বলে—তবু বাঁচা যায় অণিমা।

অণিমা দেখছে ওকে।

ওর ডাগর চোখে আজ সেই অব্যক্ত বেদনার টলমল আভাষ।

এমনি করে অতীতেও আর একজনের কাছে বাঁচার আশ্বাস খুঁজেছিল। অভিজিৎ যেন সেই কথাটাই শোনাতে চায়।

অভিজিৎ বলে—সমাজের রূপ বদলেছে, বাঁচার কথাটাই এখন বড় অণিমা. তাই সেদিন যা সম্ভব ছিল না সমাজ আজ তাকে মেনে নিয়েছে বাঁচার প্রয়োজনে।

অণিমা চুপ করে থাকে।

তারাগুলো আকাশের বুকে নক্সা কেটেছে—লেকের শান্ত জলে তাদের চুমকি বসানো। ওই আঁধার শূন্যতার বুকে অণিমাও যেন কিসের ব্যর্থ সন্ধান করে।

হঠাৎ খেয়াল হয় অণিমার।

—এ্যাই! ফিরতে হবে না? ওঠো। তোমার না হয় ঘরের তাড়া নেই, আমার তো আছে।

অভিজিৎ অপিসের ফ্ল্যাটে থাকে। বিয়ে থাও করে নি।

অণিমা বলে—এবার তোমার ওই ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করছি আমি।

চাইল অভিজিৎ।

অণিমা বলে—জাঁদরেল দেখে একটি মহিলা খুঁজছি তোমার ঘাড়ে তাকে চাপিয়ে দেব। ব্যাস দেখবে তখন অপিস আর বাড়ি! এছাড়া আর কিছুই ভাববার সময় থাকবে না। ওঠো।

অভিজিৎ বলে—তাতে লাভ কি হবে তোমার? বেচারাকে বধ করোনা। এই বেশ আছি।

হাসছে অণিমা। এই ক্ষণিক মুহূর্তগুলোও অণিমার নিঃস্ব জীবনের নিঃসঙ্গতাকে ভুলিয়ে দেয়।

সেদিন খবরটা শুনে চমকে ওঠে অণিমা।

সবিতাও অন্য মেয়েদের মহলে হয়তো গুঞ্জরণ ওঠে। সবিতা এখন অনেক বদলে গেছে। আগেকার মত ঘর বাঁধার ব্যাকুলতা আর নেই। সবিতার পোষাক-আসাকও বদলে গেছে। রঙ্গীণ শাড়ি পরেনা, এখন হালকা গেরুয়া রং-এর শাড়ি—গেরুয়া উড়নি পরে অপিসে আসে। কোন এক গুরুদেব-এর কৃপা ধন্যা হয়ে সবিতা এখন গীতা পড়ে ধর্মাচরণ করে। অনিত্যতা সম্বন্ধে এখন বেশ জ্ঞানলাভ করেছে সে।

সবিতা অণিমার সেকশনেই রয়ে গেছে। রিটায়ারিং রুমে ও যায়। ওই নিবেদিতা লতিকা রেবাদের আগেকার সেই উচ্ছলতা নেই। ক'বছরেই তাদের এই অপিসের জীবনের পরিক্রমা দু'বেলা ট্রাম বাসে আসা যাওয়ার ধকল আর সংসারের চাপে তাদের সেই কাকলি, কলরব থেমে গেছে।

বরং নোতুন আরও কিছু মেয়ে ঢুকেছে। তারা আরও বেপরোয়া। সেদিন নোতুন মেয়েদের কে একজন ইয়ার্কি করে ওখানে বসে সিগ্রেটই ধরায়। পরণে স্ল্যাকস্-শার্ট, চুলগুলো বব্‌করা। শিষ দিয়ে ইংরাজী পপ্‌ সং গেয়ে আরও দু'তিনজন মেয়ে সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে বুক পাছা কাঁপিয়ে ট্যুইষ্ট নাচের ভঙ্গী করে।

নিবেদিতা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

লতিকা বলে—এ্যাই মেয়েরা কি করছো?

হাসছে ওরা। নাচের ভঙ্গী তবু চলেছে।

নোতুন মেয়েদের কে একজন বলে—জাষ্ট এনজয়িং নিভু দি—

অণিমা মাঝে মাঝে আসে এখানে। আজ ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ

নোতুন ওই মেয়েদের ওই ভাবে সিগ্রেট মুখে নাচতে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

রেবা ওদের সাবধান করার চেষ্টা করে।

—এ্যাই শীলা! অণিমা দি—

শীলা বড় চুলগুলো ঘাড় নেড়ে মুখ থেকে সরিয়ে একটু তাচ্ছিল্য ভরা স্বরে বলে—সো হোয়াট! অফিসার আছেন অপিসে, এখানে রিটায়ারিং রুমেও অফিসারী চালাবে কেন বাবা!

লিলি সরু গলায় ঢুলু ঢুলু চোখে কোমরে হাত দিয়ে দেহটাকে ঝটকা মেরে কাঁপিয়ে গেয়ে চলেছে,

ইউ লাভ মি গাই লে মি কিস্ ইউ!

অণিমা চলে এল! সবিতা ওদিক থেকে উঠে পড়েছে।

ওদের কে বলে—গীতাটা পড়ে রইল যে সবিতা দি। কর্মযোগ—

হাসির হররা ওঠে।

নিবেদিতা, লতিকারাও আজ নোতুন ওই জীবদের দুঃসাহস আর রুচির বিকৃতি দেখে চমকে উঠে প্রতিবাদ করে—থামবে তোমরা! ছিঃ ছিঃ!

কিন্তু ওদের যেন এদিকে কান নেই।

নিবেদিতা লতিকারা এর আগেও অপিসের সামান্য খবর নিয়ে হাসাহাসি করতো। ওদের কাছে শীতল-সবিতা, গোপেন-রমলার মেলামেশা নিয়েও আলোচনা হয়। তেমনি আড়ালে ওদের মধ্যে অণিমা-অভিজিৎ-এর মেলামেশা নিয়েও কথা ওঠে।

নিবেদিতা বলে—দু'জনে তো বেশ জমেছে।

লতিকা জানায়—অফিসের পর গঙ্গার ধারে, লেকের ওদিকেও যান, অণিমা তো সত্যিই একা!

নিবেদিতা বলে—মেয়েতো আছে!

—তারজন্য সবকিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে?

লতিকার কথায় অণিমার সমবেদনাই ফুটে ওঠে। বলে রেবা,

—বিয়ে থা করার পর একজন পুরুষের উপর কিছুটা নির্ভরতা

আসে। হঠাৎ সেটা পায়ের নীচে থেকে সরে গেলে তখন সত্যিই কষ্ট হয় রে।

রেবার জীবনেও এই যন্ত্রণা ছিল।

প্রথম কয়েক বছর পরই তার স্বামী মারা যায়। রেবা জানে সেই অবস্থার কথা। তাই হয়তো গোপেনকে বিয়ে করেছিল। আজ তারা সুখী হয়েছে।

নিবেদিতা বলে—তাহলে তো বিয়ে করলেই পারে!

সবিতা চুপকরে শুনছে কথাটা। ওদিকে সে নোতুন মেয়েদের ওই চীৎকার আর হল্লার শব্দে ওরা থেমে গেছে। লিলি বলে,

—বিয়ে! ফুঃ। তার চেয়ে এনজয় ইয়োর লাইফ!

সিটি দিয়ে ওরা গাইছে—গেট গোয়িং।

সব যেন কেমন গুলিয়ে যায়।

সবিতা বের হয়ে আসে।

অণিমার কানে আসে এসব কথা।

সবিতাই বলে—ওদের এসব আলোচনার কি দরকার। আর ওই মেয়েরাও তেমনি। দিন দিন যা হচ্ছে? সন্ধ্যার পর দেখবে দুএকটা ছেলেকে জড়িয়ে নাইট ক্লাব, ডিস্‌কো—সব জায়গাতেই যায় ওরা। মদও খায়টায় শুনেছি।

অণিমা দেখেছে ওই মেয়েদের উদ্দাম ভাবে চলতে।

তারও ভয় হয়! সীমার ওই উদ্ধত চাহনি নীরব প্রতিবাদের কাঠিন্যে কোথায় তার মায়ের মনও ভয় পেয়েছে। সমস্যাগুলো এমনি করেই দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিচিত্ররূপে চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

সেই সঙ্গে মনে হয় নিজের কথাও।

তার শূন্যতার কথা। ওদের আলোচনাকে কোন গুরুত্ব দেয় নি অণিমা। জানে সে এর মূলে কোন সত্য নেই। তবু তার বঞ্চিত নারী মনে সুর ওঠে।

সেদিন খবরটা শুনে খুশী হয় মনে মনে।

অভিজিৎ-এর প্রমোশনের চান্স এসেছে। বাইরে কোথায় এজেন্ট করে পাঠানোর কথা উঠেছে। এনিয়ে এগিয়েছেও অনেক দূর।

অভিজিৎও জানে সেটা।

তার কাছে আজ এটা যেন অন্যভাবেই এসেছে। একা মানুষ। হঠাৎ এখানে তার অজানতেই সে একটি সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে। হয়তো তার মনও স্বপ্ন রচনা করে। সেদিন প্রমোশনের কথায় অভিজিৎ বলে মিঃ বোসকে—এখন কিছু দন ওটা থাক স্যার!

মিঃ বোস ওর দিকে চাইলেন—সে কি! বাইরে যাবে না? প্রমোশনও ডেফার্ড করতে চাইছো?

অভিজিৎ কি ভাবছে। বলে সে,

—একা মানুষ স্যার। আবার এসব ঝামেলা নিয়ে কোথায় যাবো। কলকাতাতেই বেশ আছি।

মিঃ বোস ওর দিকে চাইলেন সন্ধানী চাহনিতে। তিনিই বলেন,

—ঠিক আছে, ভেবে ছ্যাখো।

সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। ছাতিম ফুলের সময়। বাতাসে ওঠে চাপা সুবাস। অণিমাও কথাটা শুনেছে।

অভিজিৎ চলে যাবে, হঠাৎ একথাটা ভাবতেও আজ দুঃখ পায় সে। তাই অভিজিৎ-এর কথায় চাইল অণিমা। অভিজিৎ বলে,

—জানিয়ে দিয়েছি। এখন প্রমোশন নেব না!

অবাক হয় অণিমা—কেন?

—বাইরে যেতে মন চায় না অণিমা! এখানে তবু—

কি যেন বলতে গিয়ে অণিমার স্থির দৃষ্টির দিকে চেয়ে চুপ করে গেল অভিজিৎ। অণিমা বলে,

—তবু প্রমোশন ফোরগো করলে? কিসের জন্য অভিজিৎ?

অভিজিৎ জানাতে চায় আজ কথাটা। অণিমাকে ছেড়ে যেতে

সে পারবে না। আজ সেও তার অজানতে জড়িয়ে গেছে তার জীবনের সঙ্গে।

অভিজিৎ-এর হাতটা অণিমার হাতে।

চমকে ওঠে অণিমা। কি আবেগে কাঁপছে ওর হাতটা, তারই স্বপ্ন জাগে অণিমার মনে। তারার আলোয় ওই নির্মল ক্ষণে দু'জনের কাছে দু'জনের মূল্যায়ন হয়ে গেছে। অভিজিৎ ফিস্ ফিসিয়ে ওঠে,

—অণিমা! এখান থেকে চলে যেতে পারলাম না তোমাকে ছেড়ে।

অণিমা কোথায় দূরে শুনেছে একটা পাখীর ডাক। তাকেও কে ডাকছে, তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে নোতুন একটি জগতের ছবি, অভিজিৎ-এর মুখ! তার নিজের মনের সুপ্ত কামনা বাসনা গুলো ঠেলে ওঠে! নিজের এতদিনের সব সংযমের বাঁধন যেন খসে পড়বে।

হঠাৎ একটা গাড়ির এক ঝলক হেডলাইটের সঙ্গে আর হর্ণের তীক্ষ্ণ শব্দটা যেন এই পরিবেশের সব শুচিতা, তাদের দু'জনের সেই ক্ষণিক স্বর্গ রচনার স্বপ্নকে কি নিষ্ঠুর আঘাতে খানখান করে দিয়ে চলেছে। গাড়ির ভিতরে কাদের কলকণ্ঠের কলরব—চীৎকার ওঠে, হাসির তীক্ষ্ণ শব্দ—ওই আলো হর্ণের শব্দ যেন এক নিমেষে এই পরিবেশটা বদলে দেয়।

চমকে ওঠে অভিজিৎ—কয়েকটা ছেলেমেয়ে নোতুন ড্রাইভিং শিখেছে বোধ হয় বাড়ির গাড়ি বের করে এনে! যে কোন মুহূর্তেই তো এ্যাকসিডেণ্ট বাধাবে!

গাড়িটা মোড়ের মাথায় তীব্র বেগে ঘুরছিল, চাকার আর্তনাদ—ওদের উচ্ছ্বাস হাসি—আর গানের টুকরা সব মিলিয়ে মনে হয় ওরা যেন এমনি একটা সাংঘাতিক কিছু করার জন্যই দৌড়াচ্ছে।

অণিমা বলে—হতচ্ছাড়ার দল। মদফদ খেয়ে ঘুরছে।

হাসে অভিজিৎ—হতচ্ছাড়িরাও রয়েছে দু'একজন।

অণিমা শোনায়—কি যে হচ্ছে ওরা অভিজিৎ। ইতরামির শেষ। শুনি মদ গাঁজাও নাকি খায়!

আজকের এ সমাজের অনেককেই দেখেছে তারা এমনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে। অপিসেও দেখা সেই মেয়েদের কথা মনে পড়ে। অভিজিৎ বলে,

—হতে পারে।

উঠে পড়ে অণিমা—চলো। বাড়ি ফিরতে হবে।

সীমা এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে।

এখনও রেজাল্ট বের হয় নি। দেখেছে সীমা এর মধ্যে বিচিত্র জগৎটাকে।

তার অস্থির মন এবার যেন সেটাকে আরও বড় করে দেখেছে তার পরিবেশের চারিদিকেই।

মা অপিস বের হয়ে যায়। নীলেশ মামারও কলেজ আছে। তাকেও বের হয়ে যেতে হয়। তারপরই বাড়ি ফাঁকা। বাড়িটায় নামে রাজ্যের স্তব্ধতা। নিতাইদা মাঝে মাঝে আসে। আর কাজের মেয়ে বাসনা নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

কথা বলারও লোক নেই।

ইরা—রেখা—লাবণ্যদের বাড়িতে যায় মাঝে মাঝে। দেখেছে সীমা তাদের বাড়ির পরিবেশ। মা, বাবা, কাকা—সব নিয়ে ওদের সংসার। ভাই বোনদের নিয়েই সময় কেটে যায়।

ছুটির বিকেল।

মায়ের অপিস থেকে ফিরতে মাঝে মাঝে দেরী হয়। সীমা হাঁপিয়ে ওঠে। তাই এসেছে ইরার এখানে।

ইরা সাজগোজ করছে। সীমাকে দেখে চাইল।

—কি রে?

সীমা বলে—চল্ একটু ঘুরে আসি। না হয় লাইট হাউসে নোতুন ছবিটাই দেখে আসবো ম্যাটিনিতে।

ইরা অবাক হয়—সে কি রে! পিসীমার ওখানে যেতে হবে। পিসেমশাই-এর অসুখ। আয় বোস।

হতাশ হয়ে বসল সীমা। ওদের আপন জন অনেক আছে। এতবড় বাড়ি, বাগানে ছোট ভাই ক্রিকেট খেলছে ভাই-বোনদের নিয়ে—কলরব ওঠে। মা-কাকীমার সাড়া মেলে। সীমার এসব কিছুই নেই!

ইরা বলে—বুঝলি আমার পিসতুতো ভাই সুবুদা, একটি জুয়েল। কিন্তু পিসেমশাই-এর সঙ্গে বনে না। সুবুদা তো বাড়ি থেকে বের হয়ে বাবার কোন সাহায্য না নিয়েই কি ফ্যাক্টরী করেছে। নিজে ইন্‌জিনিয়ার কি না। ও বলে কি জানিস—আমার বাবার টাকায় পাপের বিষ আছে—ক্যাপিটালিষ্ট।

হাসছে সীমা—তাই নাকি রে! তাহলে যা বাপু এমন বীরপুরুষ দাদা-পিসীমাদেরই দর্শন করে আয়। আমি চলি রে।

আইভিদের বাড়িতেই এসেছে।

আইভি নেই। ছুটিতে কাল কোথায় তার দাদা বৌদির বাসায় গেছে সাহাগঞ্জে। গঙ্গার ধারে সাজানো ছোট পরিবেশ।

···সীমার যেন কোথাও ঠাঁই নেই।

একা একা সিনেমায় যেতেও মন চায় না। লেকের ওদিকে ফুচকাওয়ালাকে দেখে এগিয়ে যায়। হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল।

—এ্যাই সীমা, তুই!

সীমা দেখছে সুরভিকে। তাদের ক্লাসেই পড়ে, দারুণ সেজেগুজে কলেজে যেতো, আর আড্ডা জমাতো দুনিয়ার ছেলেদের সঙ্গে। সুরভির সঙ্গে আরও একটি মেয়ে। পরনে বেলবট—ঠোঁটে গালে হালকা লালচে রং-এর কৃত্রিমতা, সযত্ন প্রসাধনও চোখে পড়ে। পরনের টিসার্ট-এর ফাঁক দিয়ে বুকের মাংসল ভাঁজটাকে প্রকট করে তুলেছে সে।

সুরভি এগিয়ে আসে—কোথায় যাচ্ছিস?

—এমনিই বেড়াতে বের হয়েছিলাম।

সীমার কথায় হেসে ওঠে সুরভি—একা! ষ্ট্রেঞ্জ! মিট—এনা, মাই কাজিন সিষ্টার। এনা—দিস্ ইজ সীমা।

সীমা দেখছে এনাকে।

সুরভির কথায় সীমা বলে—না রে। ইরা-আইভি ওদের ওখানে গেছলাম, ভাবলাম লাইট হাউসে ছবি দেখবো। তা ওরা ব্যস্ত।

সুরভি বলে—ওমা! আমরাও তো যাচ্ছি সেখানে। চল।

সীমা কি ভাবছে। তার সব শূন্যতা বড হয়ে উঠেছে, সেও এগিযে চলে ওদেব সঙ্গে।

সীমা আজ সন্ধ্যায়, এক নোতুন খুশীভরা জগৎকে দেখেছে। লাইট হাউসের লবিতেই অপেক্ষা করছিল প্রকাশ মেহরা, ববি প্যাটেল, রবি রায়।

ওদের দেখে প্রকাশ মেহরা এগিয়ে আসে।

—এ্যাই সুরভি, এত দেরী?

হাসছে সুরভি—নোতুন বান্ধবীকে আনলাম—দিস্ ইজ সীমা। প্রকাশ—ববি—রবি। মিট দেম।

প্রকাশ মেহরাই যেন দলপতি। দামী প্যাণ্ট সার্ট এর বোতাম-এর বালাই নেই। বুকটা দেখা যায়। কাঁধের উপর চুলগুলো পড়েছে। সীমাকে দেখছে সে।

ফর্সা—সুগঠিত চেহারা। সারা দেহে যৌবনের প্রথম সাড়া, চোখ দুটো চিকচিক করে কুমারী সুরভি শুচিতায়।

সুরভি এনাও দেখছে প্রকাশকে।

হেসে ওঠে সুরভি—কি প্রকাশ, একেবারে ট্যারা হয়ে গেল যে। কেমন দেখছো?

প্রকাশ বলে—মাই গড। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতই রূপ। রিয়েলি এ জেম। কাম অন্ সীমা।

সীমাও প্রথম পরিচয়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠেছে।

রবি রায় বলে—সত্যি সুরভি, ওকে এনে ভালো করেছো।

—কেন? তোমার লোভ হচ্ছে নাকি? টেক কেয়ার—সীমা কিন্তু প্রকাশকেই পছন্দ করে।

সীমা ধমকে ওঠে—থামবি সুরভি?

হাসছে ওরা।

ছবি শুরু হয়েছে। ওদের ছবির দিকে নজর নেই।

প্রকাশ কি বক বক করে বলছে। সীমা দেখছে সুরভিদের। আবছা আলো আঁধারিতে সীমা দেখছে সুরভির চোখে কি নেশা। মনে হয়, এই পরিবেশেই সুরভি যেন ওপাশে বসা ববি প্যাটেলের লোভী হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছে।

সীমার ভয় করে। তবু মনে হয় এমনি এক জীবনকে সে দেখেনি, আজ নোতুন করে আবিষ্কার করছে।

ছবির পর ওরা স্নাক বারে গেছে। চকোলেট খেতে খেতে বলে সুরভি—একি নিরামিষ্যই হবে প্রকাশ! তুমিও আজ বদলে গেছ!

—লেট আস্ হ্যাভ সাম বিয়ার।

চমকে ওঠে সীমা—না!

ঘড়ির দিকে চাইছে সে। মায়ের ফেরার সময় হয়ে গেছে।

বলে সে—আমি এবার যাই। বাড়ি ফিরতে হবে।

সুরভি অবাক হয়—সবে তো সন্ধ্যা রে। আর বিয়ারের নামেই ঘাবড়ে গেলি।

ববি বলে—তোমার বন্ধু বিয়ার নয় বোধ হয় ম্যারিজুয়ানা চাইছে সুরভি। কি রে প্রকাশ—দে না একটা গ্রাস।

সীমা এসব নেশার কথা শুনেছে। তাই ভয়ে ভয়ে বলে,

—না! প্লিজ! ওসব আমি খাইনা। বাড়ি ফিরতে হবে।

প্রকাশ মেহরা এদের মধ্যে চতুর। সে জানে একটু রয়ে সয়ে এগোতে হয়। তাই বলে সে,

—ষ্টপ দিস্ নন্‌সেন্স সুরভি। চলো সীমা, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার বাড়ীটা ত চেনা হবে। কাম অন্।

ওদের কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই প্রকাশ সীমাকে নিয়ে ওপাশে পার্কিং করা গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়।

গাড়ির মধ্যে ববি সিগ্রেট টানছে, বিশ্রী গন্ধ ওঠে। প্রকাশও সেই সিগ্রেট ধরায়। সুরভি বলে—সিগ্রেট দেখলে সীমার ভয় করে।

সীমা হাসছে। ক্রমশঃ এদের দলে নিজেকেও ভীরু প্রতিপন্ন করতে চায়না। তাই বলে সে—ঠিক আছে। কেন খাবো না!

সকলেই উল্লাসে চীৎকার করে—থ্রি চিয়ার্স ফর সীমা।

সীমা দু' একবার সিগ্রেট খায়নি তা নয়। কলেজ সোশ্যালে কোন অনুষ্ঠানে, সেবার স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট বের হবার পর ইরা আইভিদের সঙ্গে দু' একবার সিগ্রেট টেনেছে। তাই এদের সিগ্রেটটা নিয়ে এক টান দিয়েছে। ওরাও চেয়ে দেখছে সীমাকে।

কি যেন হয়ে যায় সীমার। মাথাটা ঘুরছে। চোখের সামনে কি যেন ঘটে যায়। হাসছে ওরা হৈ হৈ করে।

সীমা সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে ওদের দলে যোগ দিয়ে হাসছে। হঠাৎ যেন দুনিয়ার চেহারাটাই অনেক রঙ্গীণ বোধ হয়। গান গাইছে ওরা সমস্বরে।

প্রকাশও নেশার ঘোরে গাড়িটার গতিবেগ তুলে ঘুরছে ওদিকে, হঠাৎ ওই হেডলাইটের জোরালো আলোর সামনে দেখছে সীমা তার মা আর অভিজিৎকে খুব ঘনিষ্ঠ অবস্থাতে। চমকে ওঠে সে।

প্রকাশ বলে—লুক অ্যাট দি এজেড লাভারস্। বয়স তো হয়েছে তবভি মোহব্বৎ কা চক্কর! চালাও বাবা।

রবি বেসুরো গলায় গেয়ে ওঠে—মোহব্বৎ কিয়া তো ডরনা ক্যা!

রবি বলে—বেশ জমেছিল ওদের মাইরী, শালা প্রকাশ তুই ঘাবড়া দিয়া উ দোনোকা। পিরীতের কাঁপ ছটকে দিলি বেটা।

সীমার মাথাটা ঘুরছে। তখনও ওর চোখের সামনে ভেসে রয়েছে ওই চকিত আলোয় দেখা তার মা আর অভিজিৎ-এর

মুখ ছুটো। রাতের অন্ধকার নির্জনে ছু'জনের এই নাটকটা আজ দেখছে সীমা।

—সীমা। ডাকছে প্রকাশ।

সীমা সাড়া দিল না। প্রকাশের হাতটা ওর পিঠ ছাড়িয়ে কাঁধের অনাবৃত নরম জায়গায় এসে কি যেন লুব্ধ ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে, ওই গরম ছোঁয়াটা সীমার সারা মনে এতদিনের অতৃপ্ত জ্বালাটাকে শান্ত করে আনে।

স্তব্ধ হয়ে ওই স্পর্শটুকু অনুভব করছে সীমা সারা মন দিয়ে ওদের বাড়ির কাছে এসে পড়তে সীমার চমক ভাঙ্গে।

—এখানেই নামবো প্রকাশ।

সীমা কোনরকমে উপরে উঠে যায়। বাসিনী দেখছে ওকে সীমার জামা কাপড় উস্কোখুস্কো, চুলগুলো এলোমেলো। মুখে-চোখে কেমন বিভ্রান্ত চাউনি। তখনও বাড়ি ফেরেনি অণিমা।

বাসনা ওর দিকে চেয়ে শুধোয়—শরীর খারাপ নাকি সীমাদি ?

—না। সীমা কোনরকমে জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

অণিমা আর অভিজিৎ-এর গাড়ি থেমেছে। ওদের টুকরো কথার শব্দ শোনা যায়। সীমা ততক্ষণে বাথরুমে ঢুকে স্নান করে দেহের গ্লানি মুছে কাপড়-চোপড় বদলে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে চোখ বোলাবার ভান করে। অণিমা ঘরে ঢুকে একবার মেয়েকে দেখে যেন নিশ্চিন্ত হয়। অণিমা বলে—বেরসনি ?

সীমা মায়ের কথায় চাইল ওর দিকে। আজ মা মেয়ের ছু'জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে। প্রকাশের সেই নিবিড় স্পর্শটুকু সামার মনে এনেছে নিজের সম্বন্ধে অন্য ধারনা। তারও আছে এক অজানা সম্পদ। সীমা সেই তৃপ্তির খবর মাকেও জানাতে পারে না। সীমা বলে,

—না। একটু পার্ক থেকে ঘুরে এলাম। তোমার এত দেরি ?

অণিমা মেয়ের কাছে আজ নিজেকে গোপন করে বলে,

—অপিসের কাজে আটকে পড়েছিলাম। ইয়ার এন্‌ডিং কিনা।

সীমা মায়ের দিকে চাইল। মা-মেয়ে নয়। ওরা যেন দু'টি চিরন্তন নারী, দু'জনে দু'জনের কাছে মনের গহনের নীরব বাসনার সুরটুকুও প্রকাশ করতে চায় না। কৃপণের মত সেই পাওয়ার তৃপ্তিটুকুকে আগলে রাখতে চায়। কেউ কাউকে একথা জানাতে চায় না।

অণিমা চলে গেল ওঘরে। ওর কথা শোনা যায়।

—বসো অভিজিৎ। রাতে ডিনার খেয়ে যাবে এখানে, নীলেশকেও বলেছি।

সীমাও শুনছে সেই আমন্ত্রণের ভাষাটা। বিরক্তি জাগে তার মনে।

কথাটা সবিতাই প্রথমে বলেছিল।

ইদানীং সবিতাও আসে এ বাড়িতে। সেই-ই বলেছিল,

—অণিমা! সীমার পরীক্ষা হয়ে গেল। অনার্স ও পাবেই। তারপর আর পড়াশোনা না করিয়ে মিঃ বোসকে বলে ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দাও। ব্যাঙ্কিং পাশ করে অফিসার হবে।

অণিমাও কথাটা ভেবেছে। বলে সে,

—দেখি।

অণিমা ঠিক গুরুত্ব দিয়ে কথাটা ভাবেনি।

এই কথার যেন পুনরাবৃত্তি করে আজ অভিজিৎও। অণিমা ভাবছে মেয়ের কথা। বলে,

—ভাবছি তেমন ভালো ছেলে পেলে বিয়ে-থা দিয়ে দেব।

সীমা যেন ওদের কাছে খেলার পুতুল। চুপকরে ওদিকে বসে সীমা ওদের কথাগুলো শুনছে। মনে পড়ে, মা তাকে আগেই হোষ্টেলে বিদায় করতে চেয়েছিলো! পারেনি তাকে বিদায় করে পথ পরিষ্কার করতে আজ তাই কোন এক নন্দদুলাল মার্কা ছেলের

সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদায় করে এবার নিজের পথে চলতে চায় সে।

সীমা মায়ের কথায় বলে ওঠে,

—বিয়ে! নিজে বিয়ে করে খুব সুখী হয়েছিলে, শান্তি পেয়েছিলে না মা?

আজ বিচিত্র চাহনি মেলে চাইল ওর দিকে অণিমা।

তার নিজের বিবাহিত জীবনের সেই বেদনাগুলোকে আজও ভোলেনি সে।

—সীমা। কি যেন বলতে চায় অণিমা।

তার নিজের মেয়েও যেন আজ তাকে আঘাত দিতে চায়।

সীমা বলে—নিজে খুব শান্তি পেয়েছিলে—আজ তাই আমাকেও সেই পথে ঠেলে দিতে চাও, না? ওসবে আমি নেই।

অভিজিৎ দেখছে অণিমাকে। ওকে এই অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য বলে সে,

—তার চেয়ে ওকে অপিসেই ঢুকিয়ে দাও, অণিমা। প্রবেশনারী অফিসার-এর চান্স পেতে পারে। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কিংটাও দিয়ে দিক।

সীমা ওর দিকে চাইল। ওরা দু'জনে যেন তাকে যে ভাবে হোক এমনিকরে আটকে রাখতে চায়।

নীলেশ বলছে—আরে বাবা! খাবার রেডি? এতক্ষণ ধরে পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। বুঝলি দিদি—যা সব লিখেছেন ওনারা—তোমার কন্যারত্নের ক্লাস-ফ্রেণ্ডেরা, তাতে মনে হয় নোতুন করে চৈতন্যোদয় করিয়ে ছাড়বে! এক ব্যাটা তো স্রেফ টুকলিফাই করেছে—তাতে দু'লাইন মাঝখানে ছাড়! উঃ হরিবল!

—তাহলে সীমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভাবছিস বল?

মায়ের কথায় সীমা মামার দিকে চাইল। ওই লোকটিই যেন তার কাছে একটু আশ্রয়স্থল।

সীমা বলে—ছাখনা মামা। মা বলে বিয়ে দেব, কাকু বলেন —চাকরীর বোয়ালে জুড়ে দেব!

নীলেশ দেখছে ওদের। তার কাছে একটা প্রশ্নও জাগে মাঝে মাঝে। তবুও ব্যাপারটা নিয়ে সে কিছু বলতে চায় নি। সীমার কথায় নীলেশ বলে,

—অবশ্য দুটোই ভালো। বিশেষ করে ওই বিয়ের ব্যাপারটা। ওটা রিয়েলি সেফ। আজকের সমাজ ব্যবস্থার মাঝেও বিয়েটাকে উড়িয়ে দিতে পারেনি। ও বিয়েটাই ভালোরে! তবে যতদিন না ভালো ছেলে পুলে তেমন মিলছে একটা অন্যপথ ভাবার দরকার।

অণিমা বলে—তাই চাকরীর জন্যে বলছি, যা টো টো করে দিনরাত বেড়ায়।

হাসে নীলেশ—অবশ্য অনেকেই এক আধটু এমন বেড়ায়, একজন যে বেড়াত তাও দেখেছি। ধর তুই ও—

অণিমা ধমকে ওঠে ওই ইঙ্গিতে—চুপকর নীলু!

নীলেশ বলে—তোর স্বামী সেই অনুদা তো নেই। বাধ্য হয়েই ও চার্জ উইথড্র করলাম।

সীমা দেখছে মাকে। অভিজিৎ-এর মুখচোখেও যেন কি সেই ভাবটাকে খুঁজছে সীমা। নীলেশ বলে,

—ততদিন বরং সীমা এম.এ-টা পড়ুক। ভালো রেজাল্ট করলে রিসার্চ করবে।

সীমা বলে ওঠে—তাই ভালো মামা।

অণিমার কথাগুলো পছন্দ হয় না। অণিমা বলে,

—চাকরির ফর্ম কাল আনছি, ওটা ফিল আপ করে পরীক্ষাটা দে—তারপর পড়ার কথা ভাবা যাবে। এর মধ্যে বিয়ে থা-র যদি ব্যবস্থা করতে পারিস ছাখ নীলু।

নীলেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে—করো যা ভালো বোঝো। কই নিতাই দা—খাবার টাবার দেবে না খালি পেটে এইসব সিরিয়াস প্রবলেম ফেস করতে হবে কেবল!

—যাই। নিতাই বাসিনীকে নিয়ে খাবার দেবার ব্যবস্থা করে।

সীমা গুম হয়ে বসে থাচ্ছে। মায়ের ওই কথাগুলো, অভিজিৎ-এর পরামর্শ কোনটাই তার ভালো লাগেনি। বার বার মনে পড়ে প্রকাশ—ববি প্যাটেলের কথা, সেই অবাধ মুহূর্তগুলোয় সীমার বিক্ষুব্ধ মন যেন এইভাবেই নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় কোন অজানার মধ্যে। প্রবল স্রোতের আবর্তে সে নিজেকে হারিয়ে দিতে চায়। আধখাওয়া করে উঠে গেল সীমা। অণিমা নীলেশও ব্যাপারটা দেখে চুপ করে।

রাত্রি নেমেছে। অভিজিৎ খাবার পরে চলে গেছে।

অণিমা নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছে। নীলেশ নেমে এসেছে ওদিকে, সীমাকে দেখে এগিয়ে যায়। ছাদের এক কোণে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সীমা, মামার পায়ের শব্দে সে চাইল।

নীলেশও দেখেছে সীমার মনের ঝড়টাকে। তার প্রতিবাদও দেখেছে আজ ওই খাবার টেবিলে। উদ্ধত যৌবনের এই উগ্র স্বভাবকে চেনে নীলেশ, তরুণ ছাত্র-ছাত্রী নিয়েই তার সময় কাটে।

—সীমা!

নীলেশ ওকে ডাকছে। বলে সে,

—সামান্য ব্যাপার নিয়ে এসব কেন করিস?

সীমা ফুঁসে ওঠে—ওই অভিজিৎবাবু কেন আমাদের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আসে? জানো মামা—ওর কথাতেই মা আমাকে কার্সিয়াং-এর হোষ্টেলে পাঠাতে চেয়েছিল, ওই আবার চাকরীর যোয়ালে যুতে আমাকে বন্দী করতে চায় কেন?

চমকে ওঠে নীলেশ।

সেও দেখছে অণিমা আর অভিজিৎ-এর ঘনিষ্ঠতা। হয়তো বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই এর মধ্যে। নীলেশ তার দিদিকে বিশ্বাস করতে পারে। তবু সেই মেলামেশাটাই আজ সীমার মনে এ সংসারে এনেছে এমনি একটি প্রশ্ন!

নীলেশ আজ সেইটা আবিষ্কার করে চমকে উঠেছে।

তবু বলে নীলেশ—আমাদের পরিবারের সব খবরই জানে ও। তাই বন্ধুর মতই কথাটা বলেছে।

সীমার চোখের সামনে ডায়মণ্ডহারবারের ঝাউবনে ওর সঙ্গে মায়ের সেই ঘনিষ্ঠতা দেখেছে। দেখছে নিজের চোখে কাল রাতে দু'জনকে অন্ধকারে নিবিড় একটি কি যেন দুর্বলতম মুহূর্তে।

অভিজিৎ-ই তার মাকে বদলে দিয়েছে, হয়তো নিষ্ঠুর করে তুলেছে।

সীমা বলে নীলেশের কথায়—আর ওই বন্ধুত্বে দরকার নেই। বন্ধু ও নয়—বন্ধুত্বের মুখোস পরা একটি অন্য মানুষ। মাকেও ঠকাবে ও!

নীলেশ এ প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে,

—ওসব নিয়ে ভাবিসনে। মা বলছে পরীক্ষা দিবি। মাকে দুঃখ দিস না। তারপর দেখাযাক ভালো রেজাল্ট হলে এম. এ-তে ঢুকিয়ে দেব। ব্যাস! ও বলছে কর—তারপর আমি তো আছিরে!

—মামা! নীলেশের কাছেই সীমা আশ্বাস চায়। দু'চোখে ওর মিনতি।

হাসে নীলেশ—ঠিক আছে শোগে-যা।

চলে গেল নীলেশ।

অণিমা মেয়েকে তাই চাকরীর ফর্মটায় চুপচাপ সই করতে দেখে মনে মনে বিজয়ী বোধ করে নিজেকে। অণিমা বলে,

—দরখাস্ত দিয়ে দিচ্ছি। ততদিন ঘোরাঘুরি বন্ধ করে এবার বইপত্র নিয়ে একটু বোস। এ পরীক্ষাও বেশ কঠিন। ফেল করলে মুখ দেখাতে পারবো না।

সীমা চুপকরে ঘাড় নেড়ে জানায়,

—তা পড়ছি, তবে বাবু বৈকালে ইরা, আইভি দের বাড়ির দিকে যাবো। দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকতে পারবো না।

—ঠিক আছে। তবে দেরী করবিনা।

সীমা অনুগতের মত মায়ের কথায় জানায়—হ্যাঁ। হ্যাঁ!

…অভিজিৎও খুশি হয় দরখাস্তখানা দেখে। অণিমার ঘরে এসেছে অভিজিৎ। ওই বলে—তাহলে সীমা চাকরী করবে?

হাসে অণিমা—মনে হল তাই! আজকাল মেয়েরা ঘর সংসারের জন্যও চাকরী নেয়। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক প্রবলেমে পড়ি অভিজিৎ। ভয় হয়—এযুগের ছেলেমেয়েরা বোধ হয় এমনিই।

অভিজিৎ চুপ করে থাকে।

তার মনে হয় কথাটা সত্যিই। আজকের সমাজের নানা সমস্যা আর বঞ্চনা তাদের জীবনটাকে চঞ্চল অস্থির করে তুলেছে। লক্ষ্য বলে কিছু নেই, আদর্শগুলোর সব ভিতও নড়ে গেছে। তাই চারিদিকেই এই অস্থিরতা। দিশেহারা ভাবই বড় হয়ে উঠেছে।

অভিজিৎও জানায়—কথাটা সত্যিই অণিমা। ওদের যেন ঠিক চিনিনা।

মাকে ফর্মটা সই করে দিয়েছে সীমা যেন কঠিন রাগের বশেই। তারই প্রতিঘাত হানার জন্যই আজও বের হয়ে পড়েছে সীমা।

সুরভি এনাও জানতো সীমা আসবেই। তারাও তৈরী হয়ে এসেছে, বাসনা দেখছে ওদের। এবাড়িতে সীমার বন্ধুদের মধ্যে ইরা, আইভি-শোভা আরও দু-চারজন মেয়ে আসে। ইরাদের চেনে বাসনা। ঘরোয়া পোষাক-আষাক তাদের—এ বাড়িতেই হৈ-চৈ করে তারা। বাসনাকে নিয়ে পড়ে ওরা।

বাসনা ওদের ভাদুর গান শোনায়। ইরাও ওর সংঙ্গে গ্রাম্যসুরে ভাদুর গান গাইবার চেষ্টা করে। ওরা এলে বাসিনীও খুশি হয়।

কিন্তু সীমার কাছে সুরভি এনাদের মত বিচিত্র মেয়েদের আসতে দেখে খুশী হয়নি বাসনা। প্যান্ট সার্টপরা। পাছা বুকের সবটাই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। মুখে সিগ্রেট ধরিয়ে সুরভি বলে বাসনাকে,

—এ্যাই শোন্! চট্ করে পান নিয়ে আয় তো! জর্দা আলাদা আনবি আর এক প্যাকেট সিগ্রেট!

বাসনার মুখ লাল হয়ে ওঠে। এ বাড়ির কর্ত্রী পর্যন্ত এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলে না। রাগটা চেপে পান সিগ্রেট এনে দিয়ে ওঘরে সীমাকে দেখে এগিয়ে যায়। সীমাও সাজছে বেশ উদগ্র সাজে।

বাসনা শুধোয়—ওরা কারা গো দিদি? কি সব কথাবার্তা আর মেয়েছেলে ফস্ ফস্ করে সিগ্রেট খায়? ওমনি পোষাক পরে? ওরা কারা গো?

সীমা চোখের পাতায় কালো পেন্সিল সাবধানে টানতে টানতে বলে—আমার বন্ধু! আমি বের হচ্ছি। মা এসে পড়লে বলবে ইরাদের ওখানে গেছি।

—ইরাদের ওখানে? বাসনা অবাক হয়। একটু আগেই শুনেছে সে ওই মেয়েটির মুখে ওরা নাকি চৌরঙ্গীতে যাবে; তাই বলে বাসনা,

—অন্য কোথায় যাবে বল্লে যে ওই মেয়েটি!

সীমা কড়া স্বরে বলে—সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। বলো ইরাদের ওখানে গেছি বুঝলে! দরজাটা বন্ধ করে দাও।

সীমা ওদের সঙ্গে বের হয়ে গেল। বাসনা চুপ করে দেখছে ওই বিচিত্র শোভাযাত্রাটিকে। তারও মনে হয় যেন ভালো কিছু ঘটতে যাচ্ছে না।

··সীমা কদিনের মধ্যে ধাপে ধাপে বেশ কিছুটা উপরে উঠেছে। এখন এই জীবনের উন্মাদনায় সেও সরিক। ক'দিনই পরপর বের হয়েছে ওরা। প্রকাশ মেহরাও এবার ক্রমশঃ নিজের স্বরূপটাকে প্রকাশ করতে চলেছে। নিষ্ঠুর লোভী একটা জানোয়ার সে। প্রথম দিন থেকেই সে দেখেছে সীমাকে আর তত যেন ক্ষেপে উঠেছে।

বাবার নানা কারবার, প্রকাশও এর মধ্যে সেই ব্যবসাতে নেমে

পড়েছে। অন্ধকার পথে টাকা রোজকার করার পথগুলো চেনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও বুঝেছে অনেক কিছুই পাবার অধিকার তার আছে। কিছু স্তাবকের দলও জুটে যেতে দেরী হয় না—ববি প্যাটেল, রবি এমনি কিছু বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে প্রকাশের দল সেই লোভী হাত বাড়িয়েছে সবদিকেই।

সীমা এখন ওই সিগ্রেটও দু-একটা খায়। নেশার চেয়ে একটা পুলক জাগে তার মনে। শিহরণ জাগে। নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেন খান্ খান্ করে দিতে চায় সীমা। ভুলে যেতে চায় তার নিঃসঙ্গতা।

ইরা-আইভি-শোভা এর তুলনায় অনেক শান্ত; সীমা যেন দুর্দাম হবার জন্যই ওদের এড়িয়ে সুরভিদের সঙ্গে অনেক সন্ধ্যায় বের হয়। জীবনটাকে যেন লুটে পুটে উপভোগ করতে চায় সে।

সুরভি-এনাও দেখছে সীমাকে। ওরা আর প্রকাশ, ববি প্যাটেল, রবি, সন্তোষ বোথরা অনেকেই দল বেঁধে বের হয়। বৈকালে গঙ্গার ধারে বটগাছের নীচে বসে হৈ চৈ করে, কোনদিন ভাসমান রেস্তোরায় যায়—না হয় পার্কষ্ট্রীট ছাড়িয়ে কোন ডিস্‌কো তে গিয়ে উদ্দাম নাচ গানে মেতে ওঠে। প্রকাশ ওকে আরও কাছে পেতে চায়। কিন্তু সীমাই এড়িয়ে আছে!

সেদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে ওদের জমায়েত চলেছে। সিগ্রেট-গুলো প্রকাশের আমদানী করা। তামাক নয় ওতে তামাকের বদলে থাকে গাঁজা না হয় চরস জাতীয় কিছু! ওরা ক্রমশঃ যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

প্রকাশই বলে—চলো আজ ডিসকো তে। দারুণ প্রোগ্রাম আছে। এ্যাই সীমা।

সীমা প্রকাশের কাঁধে ভরদিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

ওরা হৈ হৈ করে চলেছে গাড়ি নিয়ে।

অণিমা অভিজিৎ বাড়ি ফিরছে। ওখানেই মাঝে মাঝে দাঁড়ায় তারা। ওদিকে গঙ্গার বিস্তারে সূর্য ডুবে যায় বিষণ্ণতার রং ছড়িয়ে—এ যেন এক নোতুন জগৎ!

অণিমার মনে কি যেন ভয় জাগছে।

দেখেছে সে সীমাকে, ও যেন বদলে যাচ্ছে। ফিরতেও দেরী হয় দু' একদিন। বলে—বন্ধুদের ওখানে গেছলাম।

বাসনা তবু আড়ালে বলে—ওর বন্ধুদের দু' একজনকে দেখেছি বৌদি! এরা যেন ক্যামন ক্যামন প্যাণ্টুনপরে চিমড়ে চেহারা। রং মাখে আর সিগ্রেট খায় গো।

অণিমা ভয়ই পায়।

সীমাকে দেখে ঝড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে ফিরতে। অণিমা চুপকরে দেখছিল! বলে সে—রাত হয়েছে, কোথায় ছিলে?

সীমা জবাব দেয়—তোমাকে বলতে ভুলে গেছলাম মা—আজ সকলে মিলে সুপার একটা নাটক দেখতে গেছলাম মুক্ত অঙ্গনে। তোমার পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি মা।

অণিমাকে এড়িয়ে গেল সে।

কথাটা অণিমা অভিজিৎকেই জানাতে পারে।

—সত্যিই সীমাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি অভিজিৎ।

অভিজিৎ বলে—এবয়সে একটু এমন হয়ই। কাজকর্মে ঢুকে যাক ও ঠিক হয়ে যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে ওরা গঙ্গার ধার দিয়ে চলেছে। সন্ধ্যার আলোগুলো জ্বলছে। হঠাৎ ওদিকে অণিমার নজর পড়তেই চমকে ওঠে সে। আবছা আলোয় ঠিকই চিনেছে সে সীমাই। সঙ্গে ক'টা ছেলেমেয়ে। হৈ চৈ করতে করতে ওরা একটা গাড়িতে গিয়ে উঠলো—সীমাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলেছে একটি ছেলে ওই গাড়িতে।

—অভিজিৎ!

অভিজিৎও দেখছে ব্যাপারটা। অণিমা বলে,

—ওই গাড়িটা কোথায় যায় ছাখোতো! ওর পিছনেই চলো। আজ একটা ব্যাপারের হেস্ত নেস্ত করতেই হবে।

অভিজিৎ ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু অণিমা বলে ওঠে

—তুমি চলো আমি বলছি। ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে অভিজিৎ! প্লিজ—চোখের সামনে ওর এই সর্বনাশ আমি মা হয়ে দেখতে পারবো না।

চৌরঙ্গীর ভিড় পার হয়ে গাড়িটা চলেছে ওদের গাড়ির পিছু পিছু।

গাড়ি থেকে নেমে প্রকাশের দল ঢুকেছে সরু পথ দিয়ে বাড়ির পিছনের প্রায়ান্ধকার একটা বড় হল ঘরে। পুরোনো বাড়িটাকে নোতুন করে সাজানো হয়েছে। দেওয়ালে নগ্ন মেয়েদের ছবি—হলের আলোটা খুবই কম। একটা ডায়াসের উপর অর্কেষ্ট্রা পার্টি তখন উদ্দাম সুর তুলেছে। ওদিকের বার কাউন্টারে ছেলেমেয়ের দল। চোখে তাদের নেশার ঘোর।

বাকী ছেলেমেয়েরা তখন জড়াজড়ি করে নেচে চলেছে ওই উদ্দাম বাজনার তালে বেতালে।

প্রকাশও সীমাকে আজ ইচ্ছে করেই এমনি পরিবেশে এনে ফেলেছে। নোতুন ওই উন্মাদনার জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় সীমা।

হঠাৎ ওই অল্প আলোয় ভিড় ঠেলে কাকে এগিয়ে আসতে দেখে চমকে ওঠে সীমা। অস্ফুট স্বরে বলে—মা!

অণিমা আজ মরীয়া হয়ে এসে ঢুকেছিল এখানে। নজর রেখেছে সে সীমার উপর, এখানে এসে কিছু বলার আগেই বাঘিনীর মত সীমার জামার কলারটা চেপে ধরে ওকে টানতে টানতে নিয়ে এল বাইরে।

অবাক হয়ে গেছে প্রকাশ, কি বলতে গেছল সে। অণিমা গর্জে ওঠে,

—সাট্ আপ্ ইউ রাস্কেল!

—মা!

সীমা বাধা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওই বিস্মিত ছেলেমেয়েদের ভিড় থেকে ওর মা ওকে টেনে বের করে এনে রাস্তায় দাঁড় করানো

গাড়িটার দরজা খুলে ঠেলে ভিতরের সিটে আছড়ে ফেলে বলে—চলো অভিজিৎ!

ব্যাপারটা নাটকীয় ভাবেই ঘটিয়েছে অণিমা।

গাড়ির ভিতর গুম হয়ে বসে আছে। সীমার ম্যারিজুয়ানার ঘোর তখন কাটছে। কি বলার চেষ্টা করে সে।

আজ অণিমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অনেক দিন থেকেই সীমা কাদের সঙ্গে মিশছে, এমনি কাণ্ড করে চলেছে। আর তাকেও মিথ্যা কথা বলে এসেছে। রাগে লজ্জায় ফুঁসছে অণিমা। আজ এর বিহিত সে করবেই।

বাড়ি পেঁছিতে সীমা নেমে চলে গেছে, অভিজিৎ দেখছে ব্যাপারটা। আজ অণিমা যেন ক্ষেপে উঠেছে। অভিজিৎ বলে, —বেশী কিছু বলোনা অণিমা।

অণিমা দাঁড়ালো না। আজ তার অনেক বড় জরুরী কথা পড়ে আছে। সে ভিতরে চলে গেল। হয়তো অভিজিৎ আসবে তাই ওকে নিষেধ করে যায়—তুমি যাও অভিজিৎ।

বন্ধ ঘরের মধ্যে আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দু'টি নারী। মা আর মেয়ে। অণিমার সামনে আজ অনেক বড় কর্তব্য। সেই মেয়ের ভবিষ্যৎ-এর প্রশ্ন। তাই কঠিন আর বিচলিত হয়েছে সে।

দু'চোখ জ্বলছে অণিমার। গর্জে ওঠে।

—ওখানে কেন গিয়েছিলি? ওই নরকে! ওরা কারা?

—প্রকাশকে চেনো না মা! বিরাট বড়লোকের ছেলে। বড় ব্যবসা।

—তাই ওদের সঙ্গে নরকে যেতে হবে? ছিঃ ছিঃ এসব কি করছিস?

সীমাও আজ মায়ের সামনে যেন ফেটে পড়তে চায়। এতদিন ধরে সেও দেখছে অনেক কিছু! মায়ের উপর জমে ওঠা ঘৃণা, বিক্ষোভ আজ ফেটে পড়ে খান্ খান্ হয়ে। সীমা শুধোয়।

—কি বলতে চাও তুমি !

—ওই নরকে গেছো লজ্জা করেনা ওই লুচ্চা ব্যাষ্টার্ডদের সঙ্গে মিশে রাস্তার মেয়েদের মত হয়ে চলেছো ! কি করছিস তাও জানিস না ?

সীমার আত্মসম্মানে মা এভাবে ঘা দেবে ভাবতে পারে নি সে। আজ সীমা ফেটে পড়ে !

—তুমি কি করছো ? তোমারও লজ্জা করা উচিত !

চমকে ওঠে অণিমা। আজ তারই মেয়ের জন্য সে নিজেকে সরিয়ে এনেছে সব কিছু থেকে, দিনরাত খেটে চলেছে তার একমাত্র মেয়ের মঙ্গলের জন্যই। আজ সেই মেয়ের মুখে এমনি কথা শুনে অণিমা জ্বলে ওঠে।

—সীমা ! মুখ সামলে কথা বল। থামবি ?

সীমা শোনায়—কেন থামবো ? তোমার খাই—সত্যি, ন্যায় অন্যায়ের কথা যদি ওঠে তুমি কেন থামাতে চাও ? ওই অভিজিৎ বাবু কেন এখানে আসে দিনরাত ? কেন ওর সঙ্গে তোমার এত মেলামেশা ?

অণিমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, সীমার গালে সপাটে একটা চড় বসিয়েছে। অস্ফুট আর্তনাদ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সীমা !

—মারলে তুমি আমাকে ! তোমার ভুলটা ভুল নয়—দোষ সব আমারই ! মারো ! খেতে পরতে দিয়ে মানুষ করেছো—মেরে ফেলার অধিকারও আছে। মারো, তাই মেরে ফেল আমাকে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সীমা।

অণিমাও নিমেষের ভুলে কি একটা কাণ্ড বাধিয়েছে।

নীলেশ এবাড়িতে ঢুকে উপরে উঠে এসে থমকে দাঁড়ায়।

মা মেয়ের ওই কথাগুলোও শুনেছে সে। জানতো এ প্রশ্ন একদিন উঠবে। কিন্তু এমনি ভাবে উঠবে তা ভাবেনি।

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে নীলেশ।

—দরজা খোল দিদি ! এ্যাই !

অণিমার মাথা ঘুরছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত—যেন পরাজিত সে। নিজের সারা মন আজ চমকে উঠেছে। সীমা কাঁদছে।

ক্লান্ত পায়ে অণিমা দরজা খুলে বের হয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল! নীলেশ এক নজরে দেখেছে অণিমাকে। ওর মুখ চোখ ফ্যাকাসে। যেন অন্য কেউ!

নীলেশ এগিয়ে যায়—চুপ কর সীমা।

সীমা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নাভিজে স্বরে বলে সে,

—যা তা বলবে মা? জানো, প্রকাশ-এর সম্বন্ধে কি বলে ও! ভালো ছেলে সে, মা আমাকে ওদের সামনে থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে বাড়িতে—

নীলেশ এখন ও প্রসঙ্গ তুলতে চায় না।

বলে সে—চুপ কর সীমা।

আজ নীলেশও এই পরিবারের অনেক সুখ-দুঃখের সাথী। জানে সে অণিমার কঠিন সংগ্রামের কথা। সে বলে,

—মা সারা জীবন খেটে চলেছে সীমা। তুই ছাড়া আর ওর কে আছে! রাগের বশে কিছু বলেছে তাই বলে ধরতে আছে সে সব? ওসব জায়গায় যাওয়া মা পছন্দ করে না সীমা। আমিও পছন্দ করি না।

সীমা চাইল নীলেশের দিকে।

সবকাজেই মামার সমর্থন সে পায়, এই প্রথম সে শুনলো তার মামাও ওখানে যাওয়া পছন্দ করে না। সীমা চুপ করে থাকে। হয়তো নিজেকে অপরাধীই মনে করে।

নীলেশ বলে,

—ওখানে যাস্ নে! ইরাদের বাড়িও তো যাস্‌নি ক'দিন। অথচ মাকে বলিস ওখানে গেছি। এ সব ঠিক নয়।

সীমা চুপ করে শুনছে কথাগুলো। নীলেশ বলে—ওঠ। স্নানটান করে খেতে চল। আমিও এখানেই খাবো।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অণিমা।

রাত্রি নেমেছে। আকাশ ভরা তারার রোশনী লোডশেডিং এর রাজ্যজোড়া নির্জন অন্ধকারে ফুটে উঠে। অণিমার চোখে ঘুম আসেনি।

রাতে খায় নি—খেতেও ইচ্ছে ছিল না তার।

স্বামী মারা যাবার পর থেকে এতটুকু সীমাকে মানুষ করছে সে। কোনদিন গায়ে হাত তোলেনি। আজ কি অসহ্য রাগে সে ক্ষেপে উঠেছিল। সীমার মনের শূন্যতাকে সে ভরাতে পারেনি, কোথাও অন্তরালে সীমা ছাড়া অভিজিৎও এসে পড়েছিল তার জীবনে। তাই মা মেয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল কিছু দুস্তর ব্যবধান। অণিমাও মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেছল।

সেই অভিমানই সীমাকে এই পথে নিয়ে গেছে। হয়তো মায়ের উপর শোধ নেবার জন্যই সে নিজেকে এ পথে নামিয়েছে। ভুল সীমা করেছে কিন্তু আজ অণিমা নিজের দোষ, নিজের দায়িত্বকে এড়াতে পারে না। কঠিন বিচারকের মত মেয়ে সেই দুর্বলতা, সেই ভুলটাকেই তুলে ধরেছে আজ।

অনুতোষের কথাগুলো মনে পড়ে।

দেওয়াল ও আজ নিরাসক্ত চাহনিতে যেন দেখছে তাদের দিকে। তার ফটোর মালাটাও জীর্ণ অতীত স্মৃতির মতই প্রাণহীণ বিবর্ণ ফুলগুলো ঝরে পড়েছে। ও এসংসারের বিস্মৃত একটি অতীত সত্ত্বা—হঠাৎ আজ অণিমার দিকে কি সে বেদনাহত চাহনি মেলে চেয়ে রয়েছে অতীতের দিক হতে।

অণিমা নিজেকেই অপরাধী মনে করে।

সীমার ঘরের দরজাটা খোলা। অসহায় একটি শিশু যেন কি বেদনায় জর্জরিত হয়ে একা এই পৃথিবীর কাঠিণ্যের মাঝে প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

ঠাণ্ডা পড়েছে।

চাদরটা চাপা দিয়ে বের হয়ে গেল অণিমা। ঘুমের ঘোরে সীমা বিড় বিড় করছে। ফর্সা কপালে কালসিটের দাগ জোরে

ধাক্কা মেরে গাড়িতে ঢোকাবার সময় লেগেছিল, নীল হয়ে ফুলে রয়েছে জায়গাটা। অণিমা বের হয়ে এল।

সীমা অবাক হয় মাকে অপিস বের না হতে দেখে।

ঘর থেকেই বের হয়নি অণিমা। অপিসে ফোন করে দিয়েছে শরীরটা খারাপ। বাসনাও অবাক হয়। এতদিন ধরে এবাড়িতে আছে, বৌদিকে দেখেছে ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক সময়ে অপিস বের হতে।

এই তার ব্যতিক্রম ঘটলো। সীমাও দেখেছে সেটা। মায়ের ঘরে একবার এসে মাকে গুম হয়ে বসে থাকতে দেখে সরে গেল সে। কাল রাতের ঝড়ের যেন জের চলেছে।

সীমা পড়তে বসে। আজ সেও বাড়ি থেকে বের হয়নি। সারাটাদিন অণিমা ঘরেই রয়েছে। আজ সে তার কর্তব্যও স্থির করে ফেলেছে।

সন্ধ্যা নামছে।

এমনি সন্ধ্যায় তারা দু'জনে অপিস থেকে বের হয়। সে আর অভিজিৎ। আজ আর সে নেই! বসে আছে ছাদে।

হঠাৎ অভিজিৎকে আসতে দেখে চমকে ওঠে অণিমা।

—তুমি!

সহজভাবেই এগিয়ে এসে বসলো অভিজিৎ! ছাদে একটু বাগান মত করেছে অণিমা। দু'চারটে ফুলের গাছও আছে। চন্দ্রমল্লিকা গাছগুলো ফুলে ছেয়ে গেছে।

অভিজিৎ বলে—অফিসে শুনলাম শরীর খারাপ; তাই ভাবলাম খবর নিয়ে যাই! কেমন আছো?

অণিমা ওর দিকে চাইল। চোখে থমথমে দৃষ্টি। আজ অণিমাকেও একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। তার জীবনে কোথাও কোন সুরই থাকার কথা নয়। কাঠিণ্য আর বঞ্চনাই তার নিত্যসঙ্গী, একথাটা

ভুলে তার কাঙ্গাল মন কিছু পাবার দুঃস্বপ্ন দেখেছিল—তাই পেয়েছে এই আঘাত। তার মেয়ের জীবনে এনেছে সে বিপর্যয়।

অণিমা বলে—একটা কথা বলছিলাম অভিজিৎ।

অভিজিৎ ওর দিকে চাইল। তারার আলোয় দেখা যায় অণিমার বেদনার্ত মুখ। অভিজিৎ বলে—কি হ'ল ?

অণিমা অপরাধীর মত জানায়—এ কথা আমি বলতে চাইনি অভিজিৎ, কিন্তু উপায় নেই! হয়তো দুঃখ পাবো আমরা দু'জনেই তবু এটাকে অস্বীকার করতে পারছি না!

অভিজিৎ ওর দিকে চাইল।

অণিমা বলে—তোমার আমার মধ্যে বন্ধুত্বের পরিচয় ছাড়া আর কোন পরিচয়ই গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এ নিয়ে কোন ভুলবোঝাবুঝি হোক কারোও মনে—এ আমি চাইনা। তাই মনে হয় আমাদের মধ্যে এই পরিচয়টুকুও মুছে ফেলতে হবে। মুছে ফেলার দরকার অভিজিৎ!

অভিজিৎ বিবর্ণ মুখে বসে আছে।

সেও কিছু চায় নি। এতদিন ধরে সেও অণিমার সান্নিধ্যে এসেছে। মনের অতলে তাই আজ হাহাকার জাগে!

—অণিমা!

অণিমা বিবর্ণ মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে বলে,

—আমাকে ভুল বুঝোনা অভিজিৎ! সীমা, আমার মেয়ের জন্যই এ শাস্তি যত কঠিনই হোক, আমাকে মেনে নিতেই হবে। আমার জীবনে পাওয়ার কোন দাবী নেই, সব মুছে গেছে। সারা জীবন এই শূন্যতার বেদনা বয়েই চলতে হবে। তুমিও আমার কথা ভেবে ক্ষমা করো অভিজিৎ। এ বাড়িতে তোমার আর না আসাই ভালো।

অভিজিৎ জবাব দিতে পারে না। সেও বিভ্রান্ত—হতচকিত। আজ তার সামনে থেকেও কি একটু আলোক আশ্বাস হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্যই।

বের হয়ে গেল অভিজিৎ।

সীমা ছাদে ওঠার মুখে অভিজিৎবাবু আর মাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ চমকে ওঠে মাকে ওই কথা বলতে দেখে। সীমা শুনেছে ওদের দু'জনের সেই কথাগুলো। মায়ের জীবনের এই বেদনাটা আজ তাকেও বিচলিত করেছে। আজ মা অভিজিৎকেও চলে যেতে বলেছে। বলেছে কেন তাও বুঝেছে সীমা।

সীমা মায়ের নিঃস্বতাকে এভাবে দেখেনি কোনদিন।

সরে গেল সে। দেখে ওদিক থেকে অভিজিৎবাবু নেমে গেলেন। সেই হাসিখুশী মানুষটি একেবারে বদলে গেছে।

অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে তাদের। সীমা চুপ করে কি ভাবছে, এ ভাবনাগুলো তার কাছে বিচিত্র বোধ হয়, মাকে সে এমনিভাবে আঘাত দেবে সেই রাত্রে তা ভাবেনি। আজ নিজেকেই অপরাধী মনে হয় তার! মায়ের সামনেও যেতে পারেনা। চুপচাপ নিজের ঘরে এসে বসলো।

অণিমা ক'দিন বের হয়নি।

পরদিন সকালে নীলেশ এসে হাজির হয়, অণিমাকে দেখে অবাক হয় নীলেশ,

—কি রে দিদি! তোর শরীর খারাপ নাকি?

—না তো!

নীলেশ কথাটা যেন মানতে পারে না। বলে,

—না! সংসারের জন্য তুই শহীদ না হয়ে ছাড়বি না। কতো করে বলি আরও লম্বা ছুটি নিয়ে চল দিনকতক হৈ হৈ করে আসি, তা যাবি না! হ্যাঁ—সীমা কই?

সীমা এসে পড়ে। নীলেশ বলে,

—তোকেই খুঁজছি। দিদি, সেই সন্ধ্যায় তুই ঠিক করেছিলি। আজকের কাগজে খবরটা দেখে এলাম কথাটা জানাতে। সীমা—সেদিন বলেছিলি প্রকাশ মেহরা না কোন দেবতাকে তোর মা অপমান করেছে! জাষ্ট সি—তিনি ক্যামন দেবতা? একেবারে অপদেবতা নাম্বার ওয়ান্।

ওই ডেনে তাকে ধরা হয়েছে আরও কয়েকজনকে—বেআইনি গাঁজা-আফিম চালানের অপরাধে!

চমকে ওঠে সীমা। কাগজে ফলাও করেই খবরটা বের হয়। অণিমা দেখায় মেয়েকে। সীমা ওই দলেই পড়েছিল। মা-ই তাকে জীবন বিপন্ন করে উদ্ধার করে এনেছে।

নীলেশ বলে—এমন মা আছে তাই বেঁচে গেলি সীমা। আমাদের মা-বাবা সব হারিয়েছিল আগেই। দু'জনে মানুষ হয়েছিলাম বহু কষ্টে। তাই বলছি সীমা—মাকে ভুল বুঝিস না রে! মাকে অযথা দুঃখ দিস নি!

নীলেশ উঠে চলে গেল।

সীমা মায়ের দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় ক'দিনেই মাকে সে-ই দুঃখ দিয়েছে বেশী। আজ মা একা—এতবড় পৃথিবীতে মা আর সে যেন পথ হারিয়ে কোন দিকহীন ঊষর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে!

—মা!

সীমা মায়ের বুকে আছড়ে পড়ে ব্যাকুল আবেগে।

অণিমার রুদ্ধ মাতৃস্নেহ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। দুটি নারীর কাছে আজ সেই হারানো সম্পর্কটা সহজ হয়ে আসে।

ক'দিনপর অণিমা অপিসে এসেছে। কাজও জমে আছে অনেক। মাথাতোলার অবকাশ নেই। ওদিকে মনোহরবাবুর একটা কেস হাইকোর্টে গেছে। ওই লোকটা যেন প্রতিজ্ঞা করে তার মনের সব শান্তিকে বিঘ্নিত করতে চায়। হাতের কাজ সেরে ফাইলটা নিয়ে অভিজিতের ঘরের দিকে চলেছে অণিমা।

ওর ঘরে যেতে চায়নি, নেহাৎ কাজের জন্যই যেতে হয়, আলোচনা করেই চলে আসবে।

সুইং ডোরটা ঠেলে থমকে দাঁড়ায়।

ওঘরে কেউ নেই। আলোটাও জ্বলেনি। শূন্য টেবিলে

ক'দিনের ধুলো জমেছে। হ্যাঙ্গারের জায়গায় কোটও নেই। চেয়ারটা শূন্য!

ওর বেয়ারা এগিয়ে আসে।

জানায় সে—খবরটা জানেন না? উনি তো নেই!

—নেই! চমকে ওঠে অণিমা।

বেয়ারা বলে—উনি আজ তিনদিন হ'ল প্রমোশন নিয়ে চলে গেছেন বেনারসে। ওখানের ব্রাঞ্চের এজেন্ট হয়ে গেছেন।

অণিমার মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। পায়ে পায়ে ফিরে এল নিজের ঘরে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে তার। পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যায়। অভিজিৎও হারিয়ে গেল!

সেই রাত্রিতে অণিমার কথাগুলো অভিজিৎও মেনে নিয়েছিল।

এগিয়ে আসেনি জোর করে তার দাবী জানাতে। তাই আজ প্রমোশনের অজুহাতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তার কাছ থেকে।

তার হাসিভরা মুখখানা মনে পড়ে। অণিমার কাছ থেকে সেও হারিয়ে গেছে। এ যেন তার অদৃষ্ট!

স্বামী-সংসার সব গেছে মায় প্রীতির বন্ধুত্বের বলিষ্ঠ হাতটা অবধি। কোন কিছুই তার জীবনে স্থায়ী হয়নি!

সীমা মাকে বাড়ি ফিরতে দেখে চাইল।

মায়ের মুখে-চোখে ভাবনার ছায়া। মায়ের বয়স হয়েছে। সেই ক্লান্তির চিহ্ন তার মুখে। সীমা পড়ছিল।

অণিমা আজ একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারে। সে ঠকেনি, অনেক হারিয়ে সে সীমাকে আবার নিঃশেষ করে ফিরে পেয়েছে!

—শরীর খারাপ নাকি মা?

সীমার কথায় আকুলতার ছায়া নামে। হাসে অণিমা।

—না রে। আমি স্নান করছি। তুই বাসনাকে চা-টোষ্ট দিতে বল। তুই খেয়েছিস তো?

সীমা ঘাড় নেড়ে এগিয়ে যায়। আজ নিজেই কিছু করার মত কাজ চায় সে।

বাসনাও অবাক হয় সীমাকে রান্নাঘরে ঢুকে টোষ্টার এ রুটি সেঁকতে দেখে। বলে সে—আমি করছি দিদি।

সীমা বলে ওঠে—কেন আমাকে করতে নেই? কই চায়ের জল চাপাও। মাখনটা দাও। টোষ্ট বানিয়ে নিই।

নিজেই হাত লাগিয়ে সীমা মায়ের জন্য টোষ্ট আর ফ্রিজ খুলে দুটো সন্দেশ বের করে এনে হাজির করে। অণিমাও অবাক হয়!

—একি রে? তুই নিজে করলি?

—কেন! করতে নেই! না আমার হাতে খাবে না? সীমা জবাব দেয়।

অণিমা সারা মন দিয়ে এমনি সহজ ভাবেই তার মেয়েকে দেখতে চেয়েছিল। তাই ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে.

—তাই বলেছি নাকি? পাগলি কোথাকার! নে, তুই নে, ধর!

সীমা মায়ের সঙ্গে বসে অনেকদিন পর সহজ হয়ে আসে।

ছাদের আলোগুলো নিভিয়ে দু'জনে বসে আছে। অণিমা বলে,

—অভিজিৎবাবু ক'দিন আগেই এখান থেকে প্রমোশন পেয়ে বদলি হয়ে চলে গেল!

সীমা মায়ের দিকে চাইল। মা কথাটা তাকেও জানাতে চায়। সীমার চোখে ভেসে ওঠে অভিজিৎবাবুর কথা। অনেক সুখে দুখে সে তাদের পাশে ছিল, হয়তো মায়ের কাছে ছিল একটা বন্ধুত্বের আশ্বাস। সীমা নিজের কানেও সেদিন শুনেছিল ওদের কথাটা। আজ মনে হয় সীমার জন্যই অভিজিৎবাবুকেও সরে যেতে হয়েছে, মায়ের কাছ থেকে একটু আশ্বাসকেও সে ছিনিয়ে নিয়েছে চরম স্বার্থ-পরের মত।

বলে ওঠে সীমা—আমি অনেক ভুল করেছি মা। ভুল করে তোমাকেও যা তা বলেছি। তাই বোধ হয় সবই আমাদের হারিয়ে যায়। এ আমি চাই নি মা।

সীমা মায়ের কোলে মুখ রেখে কি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অণিমা মেয়েকে আঁকড়ে ধরেই তার জীবনের সব নিঃস্বতাকে ভুলতে চায়!

অন্ধকার থেকে ওরা নীলেশের চীৎকার শুনতে পেয়েছে। ও আসে ঝড়ের মত।

—কইরে দিদি। সীমা।

সীমা আলোটা জ্বালে। নীলেশ ব্যাগটা হাত থেকে ফেলে বলে,

—কনগ্রাচুলেসনস্ সীমা। ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স নিয়ে পাশ করেছিস। আজই রেজাল্ট বের হয়েছে। আগে খাওয়া, দাঁড়া। ভারমুক্ত হই।

নীলেশ এপকেট সেপকেট থেকে টুকরো টাকরা কাগজ বই-এর ছেঁড়া পাতা বের করে একরাশ! সীমা বলে,

—ওসব কি?

—চোঁত্! চোঁথা, বাবুরা এম. এ. পরীক্ষা দিতে বসে টুকছিলেন। সেই সব।

—সেকি! অবাক হয় সীমা।

নীলেশ বলে—এই এখন পাশ করার মেইড ইজি। ছ্যাথ পড়বি কিনা। এখন এবিদ্যা রপ্ত করতে হবে। ইউনিভার্সিটি করিডরে কি লেখা আছে জানিস!

—টোকাই স্বর্গ টোকাই ধর্ম, টোকায় নাইক পাপ।

তুই টুকবি, আমি টুকবো, টুকেছিল তোর বাপ। বোঝ!

হঠাৎ নীলেশ দিদির দিকে চেয়ে অবাক হয়। চুপ করে বসে আছে অণিমা। নীলেশ বলে—কি হ'ল রে! মেয়ে ভালো রেজাল্ট করলো—তুই 'ডেফ এণ্ড ডাম্ব'-এর মত বসে আছিস?

অণিমার দু'চোখে জল নামে। বলে সে—সে তো এসব শুনলো না। তুই যা ভালো বুঝিস কর নীলু! চাকরীতে ওর দরকার নেই। ওকে পড়তেই বল। সেই সঙ্গে একটা ভালো ছেলের খোঁজ পত্তর কর নীলু।

নীলেশ হেসে ওঠে—আগে ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হোক,

ছাখনা ভালো ছেলে পুলে ওখানেও জুটে যেতে পারে। আশা ছাড়িস না সীমা।

সীমা ধমকে ওঠে—থামবে মামা! নাহলে চা-টোষ্ট সন্দেশ কিছুই আসবে না! নিজে তো একটা জোটাতে পারলে না। আবার কথা!

হাসছে নীলেশ—ঠিক আছে।

এ বাড়ির সেই কঠিন পরিবেশটা অনেক সহজ হয়ে আসে। অণিমাও হাসছে ওদের এই কথায়।

জীবনের প্রবাহটা কোথাও থামে না। নদীর প্রবাহের মতই বয়ে চলে। কখনও তার দু'দিকে জেগে ওঠে উষর বালুচর, কখন শ্যাম-সবুজ শস্যক্ষেত্র, কোথাও কোলাহল মুখর জনপদ, ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কথার সুর শিশুদের চীৎকার, আবার সেই শান্ত জীবনের মায়া কাটিয়ে সে কোন শূন্যতার বুক চিরে বয়ে যায় সাগরের সন্ধানে!

অণিমা সীমার জীবনেও সেই ছন্দের ব্যতিক্রম ঘটেনি। সীমা আবার তার সেই চেনাবৃত্ত পথেই ফিরে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই।

ইরা শুভা আইভিরা ওকে সেদিন দেখে জড়িয়ে ধরে।

ইরা বলে—কোথায় ডুবেছিলি এ্যাদ্দিন! এ্যাঁ—শুনলাম দারুণ রেজাল্ট করেছিস! মামাবাবুর কোচিং-এর গুণ যাবে কোথায়! ভাগ্নীকে এবার ফার্ষ্ট ক্লাশ এম. এ. করিয়ে ডক্টরেট বানাবেনই!

আইভি বলে—তোর হিংসে হচ্ছে নাকি রে? তুই তো বাবা নিজেই ডক্টরেটকে বধ করছিস। বেচারা দিল্লী থেকে ফর্দ ঝাড়ছে। বিয়ে থা কর বাবা সলিলবাবুকে।

ইরা ধমকে ওঠে—থাম তো!

ইরা হৈ চৈ নিয়েই থাকে। ধনীর মেয়ে—তাই এসব উৎপাত ওর বাড়ির সকলেই সহ্য করে। ইরা বলে,

—তোর কাছেই যাচ্ছিলাম সীমা। এবার দোলের দিন অনুষ্ঠান করছি চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য। কিন্তু তোকে তো চাই! চিত্রাঙ্গদা করবে কে?

সীমা বলে—আমি তো নাচ ছেড়ে দিয়েছি রে ?

আইভি বলে—বললেই হ'ল ? ও দু'চার দিন রেওয়াজ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। সব কিছু প্রোগ্রাম কাষ্টিং করে বসে আছি। উনি না বলছেন ! বাঃ !

সীমা বলে—মা পছন্দ করে না রে। বলে পড়াশোনা কর ! ওসব নিয়ে থাকিস না। তাছাড়া সন্ধ্যার মুখেই বাড়ি ফিরতে হয়।

ইরা বলে—ওসব হবে বাবা। আমরাই যাবো মাসীমার কাছে।

অণিমা বেশ কিছুদিন পর আবার ইরা আইভিদের দলকে পেয়ে খুশী হয়। নিশ্চিন্ত বোধ করে সে সীমা আবার সহজ স্বাভাবিক জীবনে সেই ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যেই ফিরে এসেছে।

অণিমা বলে—এসো। বাসনা, কি আছে দে এদের। কি খাবে ?

—পকৌড়ি আর কফি। ইরাই ফরমাস করে।

ওদের সঙ্গে অণিমাও সহজ হয়ে উঠেছে। ইরা কথাটা জানায়। ওদের ফ্যাংশানের কথা। ইরা বলে,

—সীমাকে বললাম ওতো বলে মায়ের পারমিশান চাই, পড়ার চাপ। বলুনতো মামা, এমনকি পড়া যে ক'টা দিন একটু রিক্রিয়েশনও করবে না ? চিত্রাঙ্গদা ওর করা আছে আগে।

অণিমা মনেমনে খুশী হয়। নীলেশ বলে,

—তা করা যায় বৈকি !

সীমাও বাড়ি থেকে আর বেরুয় না বেশী। ক্লাশ করতে যায় আর ফিরে আসে। ওকে বাড়িতে বন্দী করে অণিমাও খুব খুশী হয়নি। সীমার সেই হালকা জীবনটা থেকে আনন্দকে কেড়ে নিয়েছে সে। অণিমা চেনে ইরাদের। তাই বলে—না, না। যাবে বৈকি !

—ব্যাস ! আইভি খুশীভরে বলে—এবার তাহলে লেগে যা সীমা। ক'টা দিন আর হাতে !

ইরাও খুশী হয়।

অনুষ্ঠানের দিন এগিয়ে আসছে। ওই কঠিন চিন্তা ভাবনা দায়িত্ব এদের বিচলিত করে তুলেছে। নানা আয়োজন করতে হচ্ছে। গানের নাচের রিহার্সেল তো আছেই। স্টেজ ডেকোরেশন —মেকআপ—লাইট নানা প্রশ্ন রয়েছে।

ইরা বলে—লাইট-এর জন্যে ধরে আনছি সুবুদাকে। ইলেক-ট্রিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার। ওর কারখানা থেকেই কিছু আলো আসবে। নিজে আলো করবে ফ্রি অব চার্জ! আলো যা হবে দেখবি তাপস সেনকে টেক্কা দেবে।

সীমা বলে—রাখতো তোর কথা ইরা। শেষকালে দেখবো রঙীন কাগজ দিয়ে শুধু আলো হচ্ছে!

—ইল্লি! ইরা চীৎকার করে—দেখিস! আর মেকআপ করবে বুলাদি। এ্যাইরে! ওকেই তো বলা হয় নি। কাল দোল—সকালে বেরুনো যাবে না।

ওরা ঘাবড়ে যায়। কাল অনুষ্ঠান, স্টেজটা বাবাই ডেকরেটারকে দিয়ে তৈরী করিয়েছেন। সুব্রতদার আসার কথা, তার লোক দিয়ে লাইট-এর ব্যবস্থা করবার জন্য। ওদিকে মেকআপ-এর জন্য বলা হয় নি!

—কি হবে? শুভাও ঘাবড়ে যায়।

সীমা বলে—চল না, বলে আসবো। একটু তো রাস্তা।

দোলের হল্লার কিছু সুরু হয়েছে। দলবেঁধে ওরা বের হয়েছে রাস্তায়। এখানেও মশগুল হয়ে ওদের আলোচনা চলেছে। হঠাৎ কয়েকটি ছেলেকে আসতে দেখে চাইল সীমা। ইরাও দেখেছে ওদের। ছেলে তিনজন ওদের দেখে কুৎসিত অঙ্গ-ভঙ্গী করে দাঁড়ালো।

সীমা ওদের মত জীবদের চিনেছে। দাড়ি গোঁফওয়ালা ছেলেটাই দলের সর্দার মত। সিট্‌কে পাকানো চেহারা—গলায় একটা চেন ঝুলছে।

ছক্কর বক্কর আঁকা জামা পরনে, ছেলেটি বলে,

—একটু দেখে যাও সুন্দরী, আমরাও রয়েছি। কৃপাদৃষ্টি দাও না একটু!

—এ্যাঁ কি রে বদনা!

সঙ্গের ছেলেটি ফোড়ন কাটে—তা মাল কিন্তু খাসা রে!

সীমা দাঁড়িয়ে পড়ে—কি বললে?

হাসছে ছেলেটি—কেন খারাপ কিছু বলেছি? এ্যাঁ বলছিলাম চল একটু বেড়িয়ে আসি।

সীমা রুখে দাঁড়িয়েছে। ইরা বলে চাপাস্বরে,

—এ্যাই চলনা।

—ভয় করছে? আমাকে? ছেলেটা গায়ে পড়ে এসে ওদের পথ আটকেছে। হঠাৎ সীমা এগিয়ে গিয়ে সিট্‌কে ছেলেটার গালেই সপাটে একটা চড় কসেছে। চমকে ওঠে ছেলেটি। অন্যজন এগিয়ে আসতে গিয়ে থামল। গর্জাচ্ছে সীমা,

—ভদ্রভাবে চলাফেরা করতে পারো না? এবার চড় মেরেই ছেড়ে দিলাম, ফের এসব দেখলে পায়ের চটি খুলে মুখ ভেঙ্গে দেব। কাঠের সোলটা কম মজবুত নয়।

ছেলেটি সরে যায়। হঠাৎ রাস্তার ওদিকে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ওঠে। একটা গাড়ির হর্ন-এর সর্ট সারকিট হয়ে গেছে। ওরা চাইল ওদিকে।

হঠাৎ কার গলা শোনা যায়—ইরা না!

ইরা চমকে উঠে চাইল—সুবুদা!

সুব্রত গাড়ি নিয়ে আসছিল ওদের বাড়িতে ওই ফ্যাংশনের ব্যাপারে। পথে হঠাৎ তার গাড়ির হর্নটি বিগড়েছে। নামতে গিয়েই সে ও দেখেছে ওই দৃশ্যটা। তেজী মেয়েটা ওই মর্কটমার্কা ছেলেটিকে সপাটে চড় কসে গর্জাচ্ছে আর ছেলেরাও সরে যাচ্ছে। মেয়েটির ফর্সা মুখ রাগে টসটসে হয়ে উঠেছে। সুন্দরীই—আর ওই বিচিত্র রূপে ওকে অপরূপ দেখায়। সুব্রত অবাক হয়ে চেয়ে আছে। ইরার ডাক শুনে চাইল সে।

ইরা এগিয়ে আসে। সুব্রত এর মধ্যে হর্নটা ঠিক করে বলে,

—তোদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।

ইরাই বন্ধুদের ডেকে পরিচয় করিয়ে দেয়—এই শুভা-আইভি আর এই সীমা এবার ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে এম. এ পড়ছে। আর সীমা এই আমার সুবুদা! সেই ইন্‌জিনিয়ার।

সুব্রত সীমাকে দেখছে। বলে সুব্রত,

—ওকে চিনেছি; ওর এই রূপও বিচিত্র।

হাসে ইরা—এই রূপেই দেখলে? ওর শ্যামার ভূমিকা দেখবে।

হাসে সুব্রত—কে জানে! তা ফিরবি তো? গাড়িতে উঠতে বল তোর বন্ধুদের।

সীমাও লজ্জা বোধ করে। তার নিজের সেই রেগেওঠা মূর্তিটার জন্য লজ্জা বোধ করে। কৈফিয়ৎ-এর সুরে বলে সে,

—জানেন না কি ইতর ওরা! তাই একটু জবাব দিলাম।

সুব্রত দেখছে মেয়েটিকে। সীমা সহজ হয়ে আসে। লজ্জাবোধ করে ওর সামনে।

সুব্রত বলে—ঠিকই করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও হারিয়েছি তাই পদে পদে দুঃখই বেড়েছে আমাদের। ঠিক করেছেন। আমিও এটাই চাই, এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক হারিয়েছি। তবু মনে হয় এটারও দরকার।

সীমা চাইল ওর দিকে সলজ্জ চাহনি মেলে, সুব্রতের মনের অতলের একটি সুর তার মনকেও চকিতের জন্য ছুঁয়ে গেছে!

সীমার কেমন লজ্জা বোধ করে ওই স্ল্যাকস্ পরা অবস্থায়। এ তার কাছে সদ্যজাগর একটি নোতুন অনুভূতি যা সারা মনকে কি সুরে ভরিয়ে রেখেছে।

তাই বাড়ি ফিরে আজ সীমা মাকে শোনায়,

—তোমার ভালো শাড়ি একটা দিও মা।

নীলেশ কাগজ পড়ছিল। দোলের দিন। আজ ছুটি। রাস্তায়

ছেলেমেয়েদের হুল্লোড় শোনা যায়, রং নিয়ে মেতেছে তারা। বড়দের উদ্দাম চীৎকারও ভেসে ওঠে।

নীলেশ সীমার কথায় চশমাটা পরে ওকে ভালো করে দেখছে। ও সীমার শাড়ি পড়ার কথায় একটু বিস্মিত হয়েছে। সীমা এতদিন ওই বেলবট স্ল্যাকস পরেছে, বাড়িতে ম্যাক্সি পরেই থাকে। তাই ওর শাড়ি পরার সখ দেখে বলে নীলেশ,

—ব্যাপার কি বলতো? হঠাৎ শাড়ি পরার মত কোন ব্যাপার ঘটতে চলছে নাকি?

চমকে ওঠে সীমা। সুব্রতের সামনে আজ ওই পোষাকে কেমন লজ্জা করছিল। তবু ঝাঁকিয়ে ওঠে সে,

—শাড়ি পরতে চাইলেই এত কথা?

অণিমা দেখছে মেয়েকে। বলে সে—ওর বন্ধু-বান্ধবরা সবাই শাড়িই পরে। বেশতো, দামী শাড়িগুলো পড়ে আছে—দেখে নে!

নীলেশ শোনায়—ও! তবে কি জানিস ওই বেলবট-ট্রাঙ্ক স্ল্যাকস-এর চেয়ে শাড়িটা মোর কষ্টলি। ঠিক আছে—মায়ের অন্‌লি ডটার তুই পরবি বইকি ওসব শাড়ি।

সীমা বলে—আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান। যাবে তো মামা? ইয়াদের বাড়ি।

নীলেশ বলে—সময় কইরে!

—মাও যাবে না। বললেন ওই সবিতা মাসীর বাড়িতে কি কেত্তন টেত্তন হবে সেখানে।

অণিমা বলে—কথা দিয়েছি রে! না গেলে দুঃখ পাবে। পরে শুনবো কেমন অনুষ্ঠান হ'ল তোদের।

সীমা কেন জানেনা মনে মনে অবশ্য খুশিই হয় ওরা কেউ যেতে পারবেনা শুনে। একাই একটি অন্য জগতের স্বপ্ন রচনা করে।

সন্ধ্যার থেকেই কলরব শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠান ছোটখাটো হলেও আয়োজনের ত্রুটি নেই। ইয়াদের বাগানে স্টেজ হয়েছে।

সুব্রত লোকজন এনে নিজেই আলোর ব্যাপারে হাত লাগিয়েছে। মেকআপ চলছে ওদিকে।

সীমার ভয় ভয় করে। এর মধ্যে ফাঁকা জায়গাটা আমন্ত্রিত দর্শকদের ভিড়ে ভরে উঠেছে। তার চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা। সুব্রতকে দেখে চাইল।

ওর পরনে প্যান্ট গায়ে গেঞ্জি। ঘামছে সে—আলো স্পটগুলো সাজিয়ে টেষ্ট করছে। হঠাৎ সীমাকে দেখে চাইল। সুব্রত বলে,

—এর আগে করেছেন তো অভিনয়? স্পটগুলো খেয়াল রাখবেন। রেঞ্জের বাইরে যাবেন না, আবার এসে ওগুলোর উপরে পড়বেন না।

সীমা বলে—ঠিক আছে।

সুব্রত ওকে মাপটা দেখিয়ে দেয়—এই অবধি সেফ জোন।

অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে। সুব্রতের আলোয় সত্যই যেন যাদু আছে। স্নিগ্ধ আলোর বর্ণাঢ্য বিন্যাসে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। সীমাও এক অতীতের যুগে ফিরে গেছে। সুঠাম ছন্দে নেচে চলেছে সে।

পৌরুষ দৃপ্ত রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। হঠাৎ সেই কঠিন পাথরের মাঝে জেগে উঠেছে এক চিরন্তন নারী কোন পুরুষের স্পর্শে। এ নারীত্বের এক নবজাগরণ। যে ভুলেছিল নিজের সত্বাকে সেই সত্বার মধ্য থেকে জেগে উঠেছে একটি মানবী, যে ভালবাসতে চায়। দু'হাত-ভরে পেতে চায় অনেক কিছু।

আলোর বর্ণালী প্রকাশ—নাচের ছন্দে—সেই ভাবটি ফুটে ওঠে

চমকে ওঠে সীমা।

ওই সুরে আলোর বৈচিত্রে, তার নিজের অন্তরের মাঝেও এ রংবদলের পরম নিগূঢ় তত্ত্বটি বর্ণময় রূপে ফুটে ওঠে। জেগে উঠেছে তার অতীতের সব ভুল—উচ্ছলতার মাঝে একটি চিরন্তন বাসনাময়ী নারী!

হাততালির শব্দে চমক ভাঙে।

—এ্যাই সীমা! ইয়া ওকে জড়িয়ে ধরে কলরব করে—দারুণ করেছিস! গ্রাণ্ড!

সীমা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ওদের চীৎকারে তার হুঁস ফেরে। মণিপুর রাজকন্যা তার মনেও সাড়া এনেছিল।

সীমা বলে—ধ্যাৎ কি করেছি কে জানে।

ওই ভিড়ের থেকে সরে এসেছে সীমা বাগানের এদিকে। কেমন লজ্জা করে তার। মেকআপের সামান্য র' লেগে আছে। শাড়িটা আলো আঁধারিতে তাকে অন্যরূপ দিয়েছে।

হঠাৎ কাকে দেখে চাইল সীমা।

সুব্রতও তাকেই খুঁজছে। সীমাও মনদিয়ে খুঁজছিল তাকে। এখানে দেখে চাইল। সুব্রত অবাক হয়ে দেখছে সীমাকে। সীমা শুধোয়,

—কি ব্যাপার! কি দেখছেন?

সুব্রত এগিয়ে এসে বলে—ওবেলায় দেখা মেয়েটি একটি বেলার মধ্যে এমনি বদলে যাবে ভাবতেই পারিনি। এ যেন চিত্রাঙ্গদার নব জাগরণ!

—ধ্যাৎ! হাসছে সীমা। ব্যাকুলভাবে শুধোয়—কেমন হ'ল? আমি একদম বাজে করেছি, না?

সুব্রত বলে—অপূর্ব। মায় ওবেলার সেই পুরুষ চিত্রাঙ্গদা থেকে এবেলার এই নারীরূপও অপূর্ব! তাই ভাবছিলাম দোলের দিন—

সুব্রত ওকে কাছে টেনে নিয়ে পকেট থেকে আবীর বের করে মুখে মাথায় আবীর মাখিয়ে দেয়। চমকে ওঠে সীমা। ওই নিবিড় স্পর্শটুকু তাকে বিভ্রান্ত সচকিত করে তুলেছে। ঝড় উঠেছে সারা মনে।

সীমাও সাড়া দিতে চায়! ওরই আবীর নিয়ে সীমাও সুব্রতের মাথা মুখ ভরিয়ে দেয়। দু'জনে হাসতে থাকে।

সীমা বলে—আপনার সাহস তো কম নয়। ওবেলার কাণ্ড দেখেও এগিয়ে এসেছেন?

সুব্রত শোনায়—সেই পুরুষ প্রকৃতির রূপ থেকে জন্ম নিয়েছে আজ অন্য একটি সত্ত্বা সীমা, আমারও মনে হয়—

—কি! সীমা ডাগর চোখ তুলে চাইল।

হঠাৎ ইরাকে আসতে দেখে থেমে গেল। ইরাও ওদের দু'জনকে এই অবস্থায় দেখে অবাক হয়।

—কি রে! একি হ'ল? সারা গায়ে মাথায় আবীর—

সীমা ওকেও দলে টানবার জন্য সুব্রতের বাকী আবীরটা নিয়ে ইরাকেও মাখিয়ে দিয়ে বলে—চুপ কর মুখপুড়ি!

ইরা মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে—চুপ তো করেই আছি! দেখালি বাবা তোরা! এ্যাই চল খেতে যাবি না?

সীমার খেয়াল হয়—তাই তো রাত হয়ে গেছে, খাবো না ইরা। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বল না—বাড়ি ফিরতে হবে।

সুব্রত বলে—যাবার পথে নামিয়ে দিয়ে যাবো। অসুবিধা হবে?

সীমা কিছু বলার আগে ইরা বলে—অসুবিধা হবে ওর? মুখপুড়ি তোর গাড়িতে ওঠার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে।

সীমা ধমকে ওঠে—ভালো হবে না ইরা। আমি টাক্সিতেই যাবো।

সুব্রত শোনায়—দোলের রাতে এই অবস্থায় টাক্সিতে যাবেন কেন? চলুন—খেয়ে নিয়ে বের হবো।

সীমা চুপ করে এগিয়ে যায়।

একটি দিনের মধ্যেই এতদিনের ধারণাগুলো বদলে যায় সীমার মনে।

ওরা ফিরছে বাড়ির দিকে। সুব্রত গাড়ি চালাচ্ছে।

সীমা বলে—আপনার বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। ওরা ভাববেন।

হাসে সুব্রত, মলিন হাসির আভা ওর বলিষ্ঠ মুখে কি যেন বিষণ্ণতাকে প্রকট করে তুলেছে।

সুব্রত বলে—বাড়ি আমার থেকেও না থাকা। বাড়িতে আমার

ঠাঁই নেই! কারখানার উপরে একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে থাকি! আমার জন্য ভাববারও কেউ নেই! অবশ্য সে দিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

সীমা ওর দিকে চাইল কি বেদনাভরা চাহনিতে। সুব্রত বলে,

—ওই অন্যায়ের প্রতিবাদের কথা বলছিলাম না, তাই করেছি, তবু নিজের বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার আছি সীমা। নিজে সৎপথে খেটে যা পাই তাই ভালো।

সীমা ওই উচ্ছল যুবকটিকে নোতুন চোখে দেখছে। সীমার মনে হয় এ পথ যেন না ফুরোয়, নির্জন পথ—পূর্ণিমার চাঁদের আলোর বান ডেকেছে। সীমা বলে—এমনি রাতে মনে হয় কোথাও হারিয়ে যাই!

সুব্রত বলে—দারুণ সাহস তো তোমার!

সীমা খুশিতে টলমল করে, দামী শাড়িতে ওর পাশে বসে সীমার নোতুন মন কি স্বপ্ন দেখে। হঠাৎ কলকলিয়ে ওঠে সীমা।

—এ্যাই। একটু ষ্টিয়ারিং ছাড়ুন, আমি চালাবো।

—তুমি! শেষকালে কোথাও ভিড়িয়ে দাও! সুব্রত চমকে ওঠে।

সীমা বলে—মা-ও এই কথা বলে।

সুব্রত গম্ভীর ভাবে শোনায়—তোমার মা বুদ্ধিমতী, তাই মেয়ের হাতে জীবনের ষ্টিয়ারিং ছাড়তে রাজী নন।

—মা! সীমা মায়ের কথা বলে,

—আমার মা সত্যিই অপূর্ব! এ জুয়েল অব মাদারস!

সুব্রত বলে ওঠে—চলো। মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাই।

চমকে ওঠে সীমা। দু'জনে আবীর মাখা অবস্থায় এই রাতে সামনে গেলে মাও অবাক হবে। কি বলবে ভেবে পায় না সীমা। সে বলে,

—এ্যাই! এ অবস্থায় আজ নয়। পরে একদিন—

হাসে সুব্রত—ঠিক আছে। আমি নিজেই আসবো।

সীমা কি ভাবছে অভয় দেয় সুব্রত—ঘাবড়ে গেলে যে? ভয় নেই সীমা।

সীমা নামছে গাড়ি থেকে। সুব্রত শুধোয়,

—কবে দেখা হচ্ছে? দরকার হলে ফোনও করতে পারো।

কার্ডখানা বের করে দেয়, সীমা ওটা ব্যাগে পুরে এগিয়ে যায় হাসি মুখে।

নীলেশ রাতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ গাড়িটা আসতে চাইল। সীমা নামছে, একটি তরুণ তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। চাঁদের আলোয় নীলেশ দেখেছে সীমার খুশি ভরা মুখখানা, নীলেশ এগোল না। তার নিজের বাড়িতে ঢুকে গেল কি ভেবে।

রাত হয়ে গেছে। তখনও ওদিকের বস্তিতে দোলের ঢোলক কর্তাল বাজছে, বেসুরো গানের শব্দ ওঠে। সীমা এখনও ফেরেনি। সবিতাদের ওখান থেকে ফিরে অণিমা বসে আছে তার জন্য।

এমনি দোলের রাতের কথা মনে পড়ে। আজ চারিদিকে পূর্ণতা আর আনন্দের রং লেগেছে। এরই আভাষ একদিন তার জীবনকেও রাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। আজ অনুতোষের কথা মনেপড়ে। এমনি দোলের সন্ধ্যায় সে আর অনুতোষ গঙ্গার বুকে নৌকায় দু'জনে বেড়াতে গেছল। ভয় করে অণিমার—জোয়ার এসেছে নদীতে, দুলছে নৌকাটা। অণিমা অনুতোষের হাতটা জড়িয়ে ধরে বলে,

—এ্যাই! ভয় করছে, ডুবে যাবে না তো?

অনুতোষ হাসছে। বলে সে—জীবন-নদীতে পাড়ি দেওয়া এমনি বিপদের অণিমা! একটু বেসামাল হলেই বিপদ।

—তবে এলে কেন?

হাসে অনুতোষ। ওকে কাছে টেনে নিয়ে মুখে মাথায় আবীর মাখিয়ে বলে—এমনি করে কাছে পাবো বলে।

চমকে ওঠে অণিমা, তার শূন্য সিঁথিও ভরে গেছে আবীরে, শাড়ির আঁচল দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে অণিমা—সব আবীরে কি করে দিলে? এ্যাই—বাড়ীতে কি বলবো?

—মা! চমকে ওঠে অণিমা।

তার অতীতের সেই নিবিড় রঙ্গিন মূহূর্ত থেকে সীমার ডাকে অণিমা এই জগতে ফিরে আসে। মেয়ের দিকে বিভ্রান্ত চাহনি মেলে চাইল সে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সীমা—তারই হারানো প্রতিচ্ছবি। দোলের রাতে সেও আবীর মেখে এসেছে আজ! চমকে ওঠে অণিমা। অতীতের সেই ছবিটা যেন এক নিমেষের জন্য তার চোখে স্পষ্টতর, জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। অণিমা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সীমাকে ওই অবস্থায় দেখে!

—এ কি করেছিস সীমা? মুখে মাথায় আবীর!

সীমা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে তরল কণ্ঠে—দ্যাখনা মা ইরাদের কাণ্ড! রাতের বেলায় আবীর মাখিয়ে ভূত করে দিল! দামী শাড়ীটাতেও আবীর লেগেছে!

অণিমা বলে—যা, ভালো করে চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে নে। এতরাতে আর চান করে ঠাণ্ডা লাগাবি না।

সীমা মাকে এড়িয়ে চলে আসার সুযোগ খুঁজছিল। মা কি যেন উত্তেজনার বশে তাদের অনুষ্ঠানের খবরও নিতে ভুলে গেছে। সীমা মায়ের ওই সন্ধানী দৃষ্টিপথ থেকে সরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে জামা কাপড় বদলে এবার ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে। দেখা নয়—এ যেন নিজেকে নোতুন করে আবিষ্কার করছে সে।

গুণগুণিয়ে গাইছে সীমা চিত্রাঙ্গদার নবজাগরণের চেতনা প্রত্যুষের সেই গান। আয়নার সামনে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে ওই সিঁথির আবীর রাগ নিয়ে এক নোতুন সীমন্তিনীকে যেন খুঁজে পেয়েছে সে। সারা শূন্যমন একটি নিবিড় আশ্বাসে ভরে ওঠে।

হঠাৎ বাইরে থেকে মায়ের ডাক শুনে গান থামালো। বাইরে থেকে অণিমা বলে—শুয়ে পড় সীমা। অনেক রাত হয়েছে।

ওখান থেকেই সীমা জানায়—শুয়ে পড়েছি মা।

আলোটা নিভিয়ে দেয় সীমা। খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক

চাঁদের আলোর বান ডেকেছে বিছানায়, সীমার চোখে ফুটে ওঠে সুব্রতের মুখখানা। নিঃসঙ্গ সে—সীমাও নিঃসঙ্গ। দুটি মন তাই যেন দু'জনকে কেন্দ্র করে আজ এই রাতে নির্জনে নোতুন স্বপ্ন রচনা করে। হিমগুঁড়ি জ্যোৎস্না নেমেছে গাছের পাতায়, ঘুম ভাঙ্গা দু'একটা পাখী কলরব করে ওঠে। এমনি শান্ত রাত্রি সীমার মনে ব্যাকুলতা আনে! এই সাড়া কোনদিন এর আগে শোনেনি তার কুমারী মন।

অণিমার মনে কোথায় একটা বেসুর বাজে। মায়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি সীমা। ভালোবাসার নীরব ব্যাকুলতাকে লুকোনো যায়না।

অণিমা কি ভাবছে। বলে সে,

—সামনের সপ্তাহে অফিসের পরীক্ষা সীমা। পড়াশোনা কর ক'দিন। আর বেরুস নে।

সীমা চুপকরে থাকে। অণিমার সকালে সময় হয় না। অফিসের গাড়ি আসবে—সে স্নান করতে ঢুকেছে। এতক্ষণ নীলেশ চুপকরে বসে ছিল। দেখছে সে সীমাকে।

নীলেশ বলে—দোলতো খুব জমিয়ে খেলেছিস মনে হচ্ছে?

সীমা বলে—কাল যা অনুষ্ঠান হ'ল, দারুণ!

নীলেশ শোনায়—তা তো বুঝছি। কিন্তু কাল রাতে কে পৌঁছে দিয়ে গেল রে? কালো গাড়ি একটা দেখলাম।

সীমা যেন ধরা পড়ে গেছে। তবু সহজ হবার চেষ্টা করে বলে,

—ওতো ইরার দাদা। রাত হয়ে গেল কিনা।

নীলেশ জবাব দিল না। কাগজটা মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। সীমা শোনায়—তোমরা যেন কি মামা! মা তো এমন ভাবে দেখছিল আমাকে। কি-রে বাবা।

নীলেশ বলে ওঠে—একবার ভুল করেছিলি সীমা, তাই মায়ের কি দোষ বল।

সীমা অপরাধীর মত বলে—আমিই হয়েছি তোমাদের বোঝা।

যত ভয়, ভাবনার কারণ, না, ? এর থেকে কি রেহাই পাবার পথ নেই মামা ? ঠিক আছে।

নীলেশ চুপকরে বসে থাকে। অণিমা বের হবার মুখে সীমার গলা শুনে এঘরে এসে ওকে না দেখে শুধায়—ও কি বলছিল-রে নীলেশ ?

চুপ করে কি ভাবছে সে। জানায়—না। ও কিছু না।

তবু অনিমার মনের ভয় যায় না। বলে সে সীমাকে—আমি যাচ্ছি। তুই বেরুবি না। পোড়াশোনা কর। এখন তো ক্লাস নেই।

সীমা ক্লান্ত নির্জন দুপুরে বইপত্রর নাড়াচাড়া করছে। পড়ায় মন বসে না। সব ছাপিয়ে বার বার ভেসে ওঠে সুব্রতের মুখখানা। তার সেই বিষন্নতার সুর ও কথা ভোলেনি সীমা।

নিঃসঙ্গতার জ্বালা তার মনে কি ঝড় তুলেছে।

হঠাৎ উঠে পড়ে সীমা। বাসনা সংসারের কাজ শেষ করে একটু বিশ্রাম নেয় এসময়। সীমা ওকে বলে—দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি ইরাদের ওখান থেকে একটা বই নিয়ে আসছি।

—এই দুপুরে যাবে ? বাসনা কি বলতে চায়।

সীমা জবাব দিল না। ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে যায় সে। বাসনাও দেখছে ওকে। সীমার মুখ চোখের কাঠিন্য তারও নজর এড়ায় নি। আজ সীমা কি এক নেশার ঘোরেই বের হয়ে গেল সেই আগেকার মত।

কারখানার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সুব্রত। নিজের চেষ্টায় ব্যাঙ্ক-লোন নিয়ে ছোট করে কারখানা চালু করেছিল একটা ঘরে। সেদিন বাবার কথাও শোনে নি। বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল প্রতিবাদ করেই।

প্রথম প্রথম বাজারে তার মালের চাহিদাও ছিল না। কাজও পায়নি তেমন। তবু লড়াই করে গেছে সে। ক্রমশঃ পায়ের তলে মাটি পেয়েছে। আজ সেই ছোট ঘরের মটর মেরামতি-রিইউণ্ডিং এর

কাজ অনেক বেড়েছে। নিজেই ছোট হাল্কা মেসিন—মটর তৈরী করছে। ছোট ঘর থেকে কারখানার এখন নিজস্ব জায়গা করেছে। ওদিকে শেড—স্টোর রুম—অপিস। অপিসের উপর একটা থাকার জন্য আশ্রয় তৈরী করেছে।

সুব্রত নিজেই সব কাজ দেখে, দরকার হলে হাতও লাগায়। দুপুরের রোদে সে ঘামছে সেডের নীচে, জরুরী অর্ডার কয়েকটি আছে, কোম্পানীও তাগাদা দিচ্ছে তাই পুরোদমে কাজ চালিয়ে সেগুলো শেষ করার চেষ্টা করছে সে, ক'দিন খেটে প্রায় কাজ সব সেরে এনেছে। তাই একটু আশ্বাস পায় সে।

এমনি দিনে আসে বড় কোম্পানীর অর্ডারটা।

অপিসে চিঠিখানা আসতে সুপারভাইজারবাবু নিজেই সেটা এনেছে। সুব্রত মেসিন ছেড়ে এগিয়ে এসে চিঠিখানা দেখে খুশীতে ফেটে পড়ে। নামকরা এই কোম্পানীর অর্ডারের জন্য সে আগেও চেষ্টা করেছিল। সেদিন এখানে পাত্তাই পায় নি সে। আজ তারা নিজেরাই যেচে তার কোটেশন মতই বড় একটা লট-এর অর্ডার দিতে চায়।

সুপারভাইজার ঘোষবাবু প্রবীণ লোক। তরুণ মালিককে সেও ভালোবাসে। ঘোষবাবু বলে—এ একটা চ্যালেঞ্জ ছিল স্যার! আজ আমাদের মালের কোয়ালিটি দেখে তারা এই অর্ডার দিয়েছে। আমাদের একবছরের কাজ পুরোই তারা টানবে।

হাসে সুব্রত—তা হবেনা ঘোষদা। আমাদের নিজেদের পার্টির কাজ যেমন হচ্ছে হবে। এর জন্য আমি আরও প্রডাকসন বাড়াবো। নর্মাল মার্কেট থেকে সরে আসা ঠিক হবে না।

সুব্রত এবার আশার আলো দেখেছে। খেয়াল হয় এখনও খাওয়া হয় নি। কাজে ডুবে থাকলে নাওয়া খাওয়াও ভুলে যায় সে! ঘোষবাবুই মনে করিয়ে দেয়—খেয়েছেন স্যার। খাবার তো কখন পাঠিয়ে দিয়েছি!

—না তো। সুব্রতের খেয়াল হয়।

ঘোষবাবু বলেন—এদিকের কাজ সামান্য যা আছে আমি শেষ করাচ্ছি। আপনি খেয়ে নিন গে।

ওদিকের হোটেল থেকে ওরাই অপিসের বেয়ারাকে দিয়ে খাবার আনিয়ে দেয় উপরে। সুব্রত এসে স্নান সেরে খেতে বসেছে। টেবিলে ছড়ানো বাটিগুলো, ভাত ও ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে গেছে। তরকারী মাছ সবই ঠাণ্ডা, কোনরকমে জলো ডাল মেখে সে ভাতগুলো খাবার চেষ্টা করে।

মনেপড়ে কালকের কথা। সারাটা দিন একটা স্বপ্নের ঘোরেই কেটেছে। সীমার ডাগর চোখে—তার বিস্মিত চাহনিটা তার অবসর মূহূর্তগুলোকে ভরিয়ে দিয়েছে কি স্নিগ্ধতায়। এতদিন সে ভেবেছে শুধু রোজকারের কথা, কারখানার কথা। আজ তার মনের কোণে ভীরুপায়ে আর একজনও এসে পড়েছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সুব্রত।

—তুমি!

সীমা যে তার এখানেই এই পড়ন্ত বেলায় এসে পড়বে তা ভাবতে পারেনি। সুব্রত অবাক হয়—কি ভাগ্যি। এসো।

সীমা দেখেছে ওর ঘরখানা। চারিদিকে অগোছালো ভাব। ব্লুপ্রিন্ট, প্রিন্টবোর্ড, ঢালাই-এর ছোট মডেল চারিদিকে ছড়ানো! ওর মধ্যে বিছানাটা পড়ে আছে। দামী বেডকভারটার কিছুটা মেঝেতে লোটানো। আর টেবিলে ওই খাবার দেখে এগিয়ে আসে সীমা। শুধায় সে,

—এই খাচ্ছো নাকি?

সুব্রত বলে—দেরী হয়ে গেল কাজে।

সীমা দেখছে ওকে। বলে সে,

—এভাবে থাকার কোন মানে হয় না! আর ঠাণ্ডা ভাত ওই খাবার—

হাসে সুব্রত—মিস্ত্রী মানুষ, এসব অভ্যাস আছে। কোনদিন

চাইনিজ কিছু আনিয়ে নিই গাড়ি ওদিকে গেলে, না হয় এখানের হোটেলেই, না হয় কারখানার ক্যানটিনে বলে দিই।

সীমা যেন নোতুন একটি সংগ্রামী তরুণকে দেখছে। সুব্রত বলে,

—আজ তুমি এসেছো আর সেই সঙ্গে আমার কারখানায় বিরাট একটা অর্ডার এসেছে। ম্যাটার অফ সেভারেল লাখস—প্রায় তিনলাখ টাকার অর্ডার। ঠিকমত কাজটা তুলতে পারলে প্রায় আশি হাজার নেট প্রফিট!

সীমা বলে—এত লাভ লোকসানের ব্যাপার বুঝি না।

সুব্রত চেয়ে থাকে ওর দিকে। বলে সে—তোমার জন্যই যেন এটা পেলাম সীমা। চলো, কারখানা দেখবে না?

সীমাকে ও তার নিজের সৃষ্টি দেখিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়।

ঘুরে দেখছে কারখানাটা। ওদিকে মটর প্ল্যান্ট, লেদগুলো ঘুরছে, সেপিং হয়ে মাল বের হচ্ছে। ওপাশে আর্মেচার ওয়াইনডিং করছে বেশ কিছু মেয়েরা, এদিকে গ্রাইণ্ডিংশপ বেল্টগুলোর সঙ্গে স্যাফ্‌ট্‌ ঘুরছে। ওদিকে নোতুন মটর—মালগুলো ফিনিস্‌ হয়ে বের হচ্ছে।

সীমা সুব্রতের সম্পূর্ণ পরিচয় পায় এখানে এসে। বলে সে—তুমি দেখছি সাংঘাতিক লোক।

সীমাও সুব্রতের এই সৃষ্টির কৃতিত্বের ভাগ পেতে চায়। এমনি একটি মানুষকেই খুঁজছিল সীমা।

সীমা বলে ওঠে—মা বলে বেকার বসে বসে বদ চিন্তা করিস কেন? তার চেয়ে আমার ওখানেই চাকরী নে। তা ভাবছি তুমিই একটা চাকরী দাওনা কেন আমায়?

সুব্রত চাইল সীমার দিকে—তাই নাকি!

সীমা জানায়—চাকরী আমিও করতে পারি স্যার। ধরো হিসাব রাখা—প্রোগ্রাম করা। ইকনমিস্‌-এ অনার্স পেয়েছি।

দু'জনে এগিয়ে চলেছে ওপাশের শেডের দিকে। ঘাসের উপর

বেলাশেষের হলুদ আলো পড়েছে। আকাশ রাঙ্গিয়ে ফুটেছে কৃষ্ণ চূড়ার ফুল, সুব্রত বলে—তারপর চাকরী করতে এসে যদি কোন বিপদ হয়, মানে মিস্ত্রী মানুষ—

কি যেন বলতে চায় সুব্রত।

সীমা হেসে ওঠে—মালিক গিরি ফলাতে চাও, এইতো।

সুব্রত কি বলতে চায়। সীমা দেখছে ওকে। সুব্রত সায় দেয়,

—যদি ধর তাই।

হাসছে সীমা। বলে সে—ওর জন্য মায়ের কাছে যেতে হবে স্যার। আমার বর্তমান মালিক নাকি তিনিই। ওসব কথা থাক, বলো চাকরীর জন্যে তাহলে দরখাস্ত দিয়ে যাই।

সুব্রত বলে—চলো। চা খেয়ে যাবে। ওদের বলে দিই।

হঠাৎ খেয়াল হয় সীমার বেলা পড়ে গেছে। বলে সে,

—আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে সুব্রত।

—এত তাড়া কিসের ?

সীমা জানায়—মা ভাববেন বাড়ি ফিরে দেখতে না পেলে।

সুব্রত বলে ওঠে—ঠিক আছে। চা খেয়ে চলো ওদিকেই যাবো, পৌঁছে দেব তোমায়।

অণিমা অপিসে গিয়েও কাজের ফাঁকে সীমার কথা ভাবছে। আজ অভিজিৎও নেই। তার অভাবটা ভুলতে পারেনি অণিমা।

বেনারস অপিস থেকে চিঠিপত্র আসে তার নামেও ডেলি অফিসিয়াল চিঠি দিতে হয় অপিসের দরকারে। সে সবই একেবারে. আইনগত ভাবেই লেখে। তাই অণিমার কাছে অভিজিৎ দূরে সরে গিয়েও মন থেকে মুছে যায় নি। তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে, অণিমাকে মেয়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে নিজেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে।

তবু এই সীমার ভাবনাগুলোর সমব্যথী ছিল অভিজিৎ। আজ

এসব ভাবনার বোঝা তাকেই বইতে হয়! অণিমা বাড়িতে ফোন করেছে সীমা আছে বোধহয়। কিন্তু চমকে ওঠে অণিমা।

ফোন ধরেছে বাসনা। সেইই জানায়—দিদি দুপুরেই বের হয়ে গেছে ইরাদের বাড়িতে।

ফোনটা রেখে কি ভাবছে অণিমা। এই একটি কৈফিয়ৎ বারবারই দিয়ে আসছে সীমা। অপিসের টেষ্ট-এর ব্যাপারে একটা সার্টিফিকেট দরকার। সীমাকে তাই দরকার। অণিমা বাধ্য হয়েই ইরাদের বাড়িতেই ফোন করে। তাকে বলে দিতে হবে ওই সার্টিফিকেটের কথা যেন নীলেশকে জানিয়ে দেয়।

ফোনটা বেজে চলেছে! বাড়িতে দুপুরের সময় বিরক্ত করতেও চায়নি সে। কে ধরেছে ফোনটা! ইরাই। অণিমাকে এসময় ফোন করতে দেখে ইরাও অবাক হয়ে জানায়—না! সীমাতো আসেনি মাসীমা।

—ঠিক আছে। অণিমা ফোনটা হাতে নিয়ে কি ভাবছে। বলে সে—যদি যায় তোমাদের ওখানে বলো আমাকে যেন ফোন করে।

ফোনটা নামিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে অণিমা, ফাইলগুলো পড়বার মত মানসিক অবস্থাও তার নেই। মনে হয় সীমা আবার একটা কাণ্ডই বাধাতে চলেছে। মেয়েকে আজ ভয় হয় তার। তাকে আঘাত দেবার জন্যই সে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই অণিমাও কঠিন হয়ে উঠে। চাকরীতেই আনবে তাকে—তবু চোখের উপর রাখতে পারবে।

নীলেশ ফিরছে বাড়ির দিকে। হঠাৎ চৌরঙ্গীপাড়ায় সীমা আর একটি ছেলেকে দেখে চাইল। মনে হয় সেই দোলের রাতেই ওকে দেখেছিল সীমাকে পৌঁছে দিতে। আর ওপাশে পার্ককরা গাড়িটা দেখেও চিনেছে নীলেশ।

সীমার খেয়াল নেই। গাড়ির কাছে এসে উঠতে যাবে সুব্রত

আর সে, হঠাৎ সামনে নীলেশকে দেখে সামনে সাপ দেখার মত চমকে উঠে সীমা।

—মামা। তুমি !...

নীলেশ দেখছে সুব্রতকে।

সীমা যে বিপদে পড়েছে তাও বুঝছে সুব্রত।

তাই সে ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্যই বলে—আপনি সীমার মামা !

প্রণাম করে সে। নীলেশও খুশি হয়।

সুব্রতই নিজের পরিচয় দিয়ে বলে—আমি সুব্রত !

কার্ডও বের করে দেয়।

সীমা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলে সে—ইরার দাদা।

নীলেশ বলে—বাড়ির দিকে যাবি তো ? ট্যাক্সি পাচ্ছি না। চলো তোমাদের সঙ্গেই যাই।

সুব্রত বলে—বেশতো ! উঠুন !

নীলেশ তার বাড়ির সামনে নেমে যেতে, সীমা বলে সুব্রতকে,

—এবার তুমি যাও। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সুব্রত আজ তৈরী হয়েই এসেছে। এমনিতে বেপরোয়া সে।

সুব্রত বলে—এতদূর এসে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা না করে যাবো না সীমা।

সীমা চমকে উঠে। মাকে জানে সে।

তাই ভয়ে ভয়ে বলে—মাকে চেনো না সুব্রত। কি জানি কি বলবে !

সুব্রত শোনায়—তারজন্য তৈরী হয়েই এসেছি সীমা। আজ না হোক একদিন তাঁর কাছে আসতেই হতো। সেটা আজই সেরে যেতে চাই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে—তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

সীমার আপত্তি নেই। সেও চায় এই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে। তবু ভয় হয় তার। সুব্রত সেটা বুঝে নিয়ে বলে,

—ভয়ের কিছু নেই সীমা। জীবনে যা চেয়েছি তা পেয়েছি। অন্যায় কিছুই করিনি আমরা কেউ। তবে এ ভয় কেন?

এর মধ্যে নীলেশ বাইরের পোষাক ছেড়ে লুঙ্গি পরে এ বাড়ির দিকে আসছিল। তখনও ওদের পথে দেখে বলে—কি ব্যাপার ও-বাড়ি যাওনি? না দিদি পত্রপাঠ বিদেয় করে দিলে হে?

সুব্রত বললে—না। যাইনি এখনও।

সীমার দিকে চেয়ে নীলেশ কি ভাবছে। আজ একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। সুব্রতও ইঞ্জিনিয়ার। যোগ্য ছেলে। কি ভেবে নীলেশ বলে,

—ভয় করছে? তা ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে। চলো দেখি।

অণিমা বাড়ি ফিরে গুম হয়ে বসেছিল। সীমা তখনও ফেরেনি, তার মনে ঝড় উঠেছে। হঠাৎ ওদের ঢুকতে দেখে চাইল অণিমা।

সুব্রত অণিমাকে প্রণাম করে। নীলেশই পরিচয় করিয়ে দেয় —ও সুব্রত মুখার্জি। ইঞ্জিনিয়ার। নিজের কারখানা—

অণিমা চেয়ে থাকে ওর দিকে। দেখছে সে সীমাকেও। সীমা যে তাকে ফাঁকি দিয়ে আবার অন্যত্র যাতায়াত করছে এটা বুঝেছে সে।

সুব্রত বলে—আপনার সঙ্গে দেখা করতে আগেই আসা উচিত ছিল। হয়ে ওঠেনি। সামান্য কারখানা আছে—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

অণিমা যেন ফেটে পড়বে রাগে। কিন্তু নীলেশের দিকে চেয়ে কোনমতে চুপ করে থাকে। চা এসেছে। নীলেশই বলে,

—তোমার ঠিকানাপত্র রেখে যাও সুব্রত। একটু আলোচনা করে পরে জানাবো।

অণিমাও এটাকে এড়াবার জন্যই বলে—এখুনি কিছু বলা সম্ভব নয়।

কথাটা সুব্রতও জানে। তাই সে জানায়—পরে একদিন দেখা করবো।

সীমা মায়ের ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুরই যেন প্রকাশ নেই ওতে। আছে সচকিত বিস্ময় হয়তো রাগই। সীমার এটা ভালো লাগে না। নিজের ঘরে চলে গেল সে।

অণিমা এবার ফেটে পড়ে—এসব কি নীলু?

নীলেশও ভেবেছে কথাটা। জানায় সে—এনিয়ে রাগ করিস না দিদি। সুব্রতর খোঁজ খবর নিই। যদি সত্যিই ভালো ছেলে হয়, আমি বলবো বিয়ে থা দিয়ে দে। ওরা সুখী হবে।

অণিমা কথাটা ভাবতে পারে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়. বুক ভরা শূন্যতা জাগে। মনে হয়, এত ভালোবাসা-ভাবনা দিয়েও সীমার মনের শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে পারেনি। তার কাছ থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে সীমা তার নিজের ভাবনার-আনন্দের পূর্ণতার জগতের সন্ধানে।

অণিমা ক্লান্ত স্বরে বলে—ছাখ খোঁজ খবর নিয়ে! আমি কিছুই ভাবতে পারছি না রে। ভালোমন্দ সব আমার কাছে একাকার হয়ে গেছে।

আজ অণিমার নিঃসঙ্গতাটা তাকে গ্রাস করেছে সম্পূর্ণভাবে। স্বামী নেই—এত কাজ এত বিস্মৃতির তলে সেই উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু কবে ম্লান হয়ে গেছে। অথচ তারই পরিচয় কি শূন্যতার বেদনা হয়ে সারা মনে হাহাকার তোলে। অভিজিৎকেও মনে পড়ে। বন্ধুত্বের দাবী নিয়েই সে খুশী থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকেও শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে, নিজের কাছে এই বঞ্চনাগুলো কঠিন তিরস্কারের মত ঠেকে অণিমার। আর যার জন্যে নিজেকে এই সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছে তার সেই একমাত্র মেয়ের কাছে কি পেয়েছে সে? শুধু বেদনাই। অন্য কিছু নয়।

সেই কথাটাই মনে পড়ে। সংসারের কাছে কিছু পেতে চেয়েছিল সে ভুল করে। আর তাই পেয়েছে এই দুঃখ আর বেদনাই।

আজ অণিমাও রাজী হয়। এই অধ্যায়ের শেষই করবে সে।

নীলেশকে ও জানায়—তুই খবর নে নীলু, যদি ভালো বুঝিস বিয়ে থা দিয়ে দে। সীমা ওর নিজের জগতে চলে যাক।

নীলেশও সায় দেয়—যেতে যাকে হবেই রে তাকে সময়মত যেতে দেওয়াই ভালো। নাহলে শুধু দুঃখই বাড়ে।

সীমা ক'দিন বুক চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটিয়েছে। দেখেছে মা চুপ চাপ রয়েছে। অনেক দূরে সরে গেছে। আর অণিমাও নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়।

এই নিস্তব্ধতার মাঝে মনে হয়, এ বাড়িটা থমথমে হয়ে উঠেছে। ক'দিন সে বাইরে চলে যাবে। মনে পড়ে বেনারসের কথা। গঙ্গার ধারে সেইখানে ক'দিন কাটিয়ে আসবে অণিমা। অভিজিৎকে লিখে দেবে—একটা আশ্রয়ের জন্য। আজ অণিমাও হয়তো একটু শান্তির কথা ভাবে তার নিঃস্ব জীবনে।

নীলেশ ক'দিনেই খোঁজ খবর সব নিয়েছে। সুব্রতের কারখানাতেও গেছে। দেখে শুনে খুশী হয় নীলেশ। সীমা ওখবরটা পায় সুব্রতের কাছে।

নীলেশ সেদিন সন্ধ্যাবেলায় অণিমাকে বলে,

—সুব্রত রিয়েলি এ গুড্ বয় দিদি, সুন্দর কারখানার মালিক। নিজের চেষ্টায় নিজের হাতে গড়েছে ওই কারখানা। রমরম চলছে ওর তৈরী ফ্যান। আর পালটি ঘরও। তুই অমত করিস না। অবশ্য বাড়িঘর—বাবা আছেন। সৎমায়ের সংসার। বাবার সঙ্গে বনিবনা নেই তাই সরে এসেছে। ওসব ঠিক আছে। সীমাও ওই কারখানার কাছে সুব্রতর ফ্ল্যাটে থাকবে। নিজের কারখানায় কাজ দেখাশোনা করবে।

অণিমা চুপ করে শুনছে কথাগুলো। নীলেশ বলে,

—ওর বাসার নাম ঠিকানাও এনেছি। আর আজ সন্ধ্যায় ওকে আসতে বলেছি। আজ রাতে খাবে এখানে—কথাবার্তা বল তুই।

কাগজটা টেবিলে চাপা দিয়ে রাখে নীলেশ। অণিমা ভাবছে।

সীমাও আজ খুশি। বিশেষ অতিথির আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে নিজেই। বাসনা বলে—তুমি সব দিকি দিদিমণি। ওসব রান্না বান্না আমি দেখছি। ওনারা রয়েছেন ওঘরে তুমি বরং ওখানেই বসগে।

সুব্রত এসেছে ভয়ে ভয়ে।

সীমার সঙ্গে একনজর দেখা হয় বারান্দায়, সীমার চোখে খুশির পলক। সুব্রত এসে বসেছে।

অণিমা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। দেখছে সুব্রতকে।

সীমা রান্নাঘর থেকে চা খাবার আনছে। মনে ওর গুণ গুণ সুর ওঠে।

অণিমার নজর পড়ে নীলেশের আনা সুব্রতের বাবার নাম ঠিকানাটার উপর। হঠাৎ তার মনের অতলে একটা ঝড় ওঠে, যেন কাঁপছে সারা আকাশ বাতাস, পায়ের নীচের মাটিটুকুও। মনে পড়ে তার সেই শ্বশুরবাড়ি থেকে সব অপমান সহ্য করে স্বামীর হাত ধরে বের হয়ে আসার নিষ্ঠুর দৃশ্যটা।

তবু বেঁচে ছিল তারা দু'জনে। মনে পড়ে অনুতোষের নিষ্ঠুর হত্যার কথা। একটা ট্রাক ওকে ইচ্ছে করেই পিষে শেষ করে গেছল, তার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছিল সেই নিষ্ঠুর হাতটা।

তবু একা নিঃসঙ্গ জীবনে সীমাকে নিয়ে বেঁচে ছিল অনেক অশান্তি সয়েও। সেই অদৃশ্য শত্রুই তার কর্মজীবনেও এনেছে অনেক বিপর্যয়। প্রতিদিনের শান্তিটুকুও কেড়ে নিয়ে ছিল।

আজ সেই একই অদৃশ্য হাতটা তার একমাত্র মেয়েকে যেন ছিনিয়ে নিতে চায় অন্য পথে। সুব্রতকে দেখছে সে!

অণিমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—মনোহরবাবু তোমার বাবা? বসন্ত নন্দন স্ট্রীটে তোমাদের বাড়ি!

সুব্রত একটু অবাক হয়েছে ওর কণ্ঠস্বরের এই তীক্ষ্ণতায়। তবু জানায় সে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নীলেশ বলে ওঠে—ওতো ও বাড়িতে বিশেষ থাকে না। বাবার সঙ্গে বনিবনাও নেই। নিজে কারখানা করেছে—

অণিমার কোন দ্বিধা নেই। তার মনস্থির করেছে [illegible] দৃঢ়কণ্ঠে জানায় অণিমা—তবু মনোহরবাবুর ছেলে তুমি! জেনেশুনে তার ছেলের সঙ্গে আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে পারি না নীলেশ! ওই মনোহরবাবুর জন্যই আজ আমি ঘর, স্বামী সব হারিয়েছি। এর পরও বলিস তুই তারই ছেলের হাতে আমার একমাত্র মেয়েকে তুলে দিতে? এ আমি পারব না সুব্রত। এ বিয়েতে আমার মত নেই।

সারা ঘরে স্তব্ধতা নামে।

ওই স্তব্ধতা খান খান্ হয়ে যায়, সীমা ট্রেতে করে চা খাবার আনছিল সেটা সশব্দে মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। সীমা আর্তনাদ করে ওঠে,

—মা! এ তুমি কি বলছো মা!

অণিমার কানে বাজে স্বামীর সেই শেষ আর্তনাদ। অনেক হারিয়েছে সে। আজ সে শেষ অবলম্বনটুকুও হারাতে রাজী নয়। কঠিন স্বরে অণিমা বলে—আমার কথা আমি জানিয়েছি সুব্রত। এরপর এবাড়িতে না এলেই খুশী হবো। সীমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক ও রাখবে না। তুমি এসো সুব্রত!

নীলেশও অণিমার এই রূঢ়তায় চমকে উঠেছে। কি যেন বলার চেষ্টা করে সে।

অণিমা আর দাঁড়ালো না, বিচারক মৃত্যু দণ্ড দিয়ে যেভাবে এজলাস ছেড়ে চলে যান ওদেরও শেষ রায় শুনিয়ে দিয়ে অণিমা উঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

সুব্রত দেখছে সীমাকে।

সীমার মুখচোখে আজ কাঠিন্যের ছাপ ফুটে ওঠে। আগেকার সেই বিদ্রোহিনী মূর্তি!

—মামা! মায়ের সব অন্যায় এমনি করে মেনে নিতে হবে? এ অন্যায়।

সুব্রত বলে—আমি চলি।

সেই সুর স্বপ্ন সব ব্যর্থতার আঘাতে খান্ খান্ হয়ে গেছে। দু'চোখ বেয়ে জল নামে! জানেনা নীলেশ সে কি বলবে। এ আজ দু'জনের মধ্যে কোন চরম বোঝাপড়ার লগ্ন তার আর কিছু করারও নেই। সারা বাড়িটা জুড়ে থমথমে ভাবটা ছড়িয়ে পড়ে রাতের অন্ধকারে।

অণিমা সকালে সীমাকে বলে,

—পরীক্ষার দেরী আছে। আমারও ভালো লাগছে না এখানে। পরশুই অমৃতসর মেলে টিকিট কাটছি। দিনকতক বাইরে ঘুরে আসবো। বেনারসে যাবো।

চমকে ওঠে সীমা। বুঝেছে তার মা তাকে সুব্রতের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আর অন্য কোথাও নয়! বেনারসে। সেই অভিজিৎ বাবুও ওখানেই রয়েছে। তার কাছেই বোধ হয়।

সীমা গুম হয়ে বসে আছে। অণিমা বলে,

—তুই গোছগাছ করে নে। বাকী যা কেনা কাটার দরকার আমি করে আনবো।

অণিমাও এই দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির ক্লান্তি থেকে কিছুদিনের জন্য মুক্তির স্বপ্ন দেখে। বেনারসের শান্ত গঙ্গার ওপারের বালুচরে সন্ধ্যা নামার ছবিটা কল্পনা করে শান্তি পায়।

বেলা হয়ে গেছে।

মা অপিস বের হয়েছে। তখনও ওইভাবে বসে আছে সীমা। বাসনা দু' একবার ডেকে গেছে। চা দিয়ে গেছে, সীমা ছোঁয়নি। হঠাৎ কার হালকা পায়ের শব্দে চটুল কলরবে জেগে ওঠে সীমা। ইরা ঢুকছে একঝলক হলুদ আলোর মত। চোখে মুখে উপছে পড়ে ওর খুশির দীপ্তি।

ইরা বলে—সামনের সোমবার আমাদের বিয়ে। বিয়ের পরই

তো দিল্লী চলে যাবো। সমরের ওখানেই পোষ্টিং। বিয়েতে আসবি কিন্তু, আসতেই হবে!

সীমা ওর দিকে চাইল, ইরা অবাক হয়—কিরে! এমন গুম হয়ে আছিস? সুবুদার খবর কিরে? তা লাগিয়ে ফেল বিয়েটা এবার বাপু!

সীমা হাসল, মলিন বিষণ্ণ হাসি।

ইরার আজ খুশিভরা মন ওর জীবনের এই বেদনাটাকে অনুভব করার সময় পায় না। ইরা বলে—চলিরে, এখনও অনেক নেমন্তন্ন বাকী। এরপর আর তো বেরুতেই দেবে না বাড়ি থেকে। যাবি কিন্তু!

ইরা ঝড়ের মত এসেছিল, ঝড়ের মত বের হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সীমা। সামনে উড়ছে ওর প্রজাপতির পাখা আঁকা রঙ্গীন কার্ডখানা। যেন সীমাকে কি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করে চলেছে।

ওদের জীবনে কোন পূর্ণতা নেই। চাকরীই করতে হবে সীমাকে।

সুব্রত আর আসবে না—সব কিছু হারিয়ে নিদারুণ রুক্ষতার মাঝেই ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকতে হবে তাকে।

ফোনটা বাজছে। বোধ হয় মা অপিস থেকে ফোন করছে।

সীমা আছে কি নেই জানতে চায়। উঠল না সীমা। মাকে আজ সে সাড়াও দিতে চায় না।

বাসনা ফোনটা ধরেছে। ওই জানায়—তোমাকে কে ডাকছে দিদিমণি!

সীমা বলে—মায়ের ফোন—

—না তো!

সীমা উঠে যায়, চমকে ওঠে সে।

সুব্রত ফোন করছে! ভেবেছিল সীমা সুব্রত মায়ের ওই অপমানের পর আর ফোন করবে না, তার সঙ্গে কোন যোগাযোগও রাখবে না।

কিন্তু সুব্রত তাকে ভুলতে পারে না। সীমার সব অভিমান যেন মুছে যায়। সাড়া দেয় সে—আমি—সীমা।

সুব্রতও বুঝেছে ব্যাপারটা।

তবু জানায় সে—জোর করবো না সীমা। সরে যেতে চাও—পথ খোলাই আছে। তবু বলবো—এটা আমাদের দু'জনের ব্যাপার। এ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। আজই—

সীমা কি ভাবছে।

জানে সে আজ তার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। সব হারিয়ে মায়ের মত নিঃস্ব শূন্য জীবনের বোঝা বয়ে দিন কাটানো—আর না হয় ভালোবেসে নিজেকে একজনের মধ্যে বিকশিত করে তোলার পথ, এ দুটোর মধ্যে একটাকে তাকে বেছে নিতেই হবে। সেখানে কোন আপোষ নেই।

মায়ের জগৎ নয়—সীমা আজ নিজের জগতের স্বপ্ন দেখে! সুব্রতের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যায়,

—তুমি আসবে সীমা?

কোন দূর থেকে ওই আহ্বান যেন সীমার মনকে স্পর্শ করেছে।

সীমা সাড়া না দিয়ে পারে না।

বাসনাও অবাক হয়। অণিমা তাকেও বলেছিল সীমার উপর নজর রাখতে। হঠাৎ সীমাকে বের হতে দেখে চাইল সে।

—কোথায় চল্লে দিদিমণি?

সীমা জানায়—এই আসছি একটু, দিনরাত কি বন্দী হয়ে থাকতে হবে!

বাসনা তবু শুধোয়—মা গোছগাছ করতে বলে গেল—

সীমা বলে—করছি তো। হয়ে যাবে সব!

বের হয়ে এল সে।

একবার থমকে দাঁড়ালো দরজার কাছে। চোখ পড়ে ওদিকে টাঙানো বাবার ছবিটার দিকে। ওই ছবিটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, দেখছে তাকে।

সীমা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ছবিটার নীচে। কি যেন আশ্বাস খুঁজছে সে ওই হারানো মানুষটির কাছে।

পায়ে পায়ে বের হয়ে যায়। জানে না সীমা এ পথ কোথায় গিয়ে থামবে। তবু যেতে তাকে হবেই।

বাসনা কিছুক্ষণের মধ্যে সীমাকে ফিরতে না দেখে অণিমার অপিসেই ফোন করেছে। কিন্তু অণিমা নেই।

কাল থেকেই তার বহু আকাঙ্ক্ষিত ছুটির শুরু। বেরুবে কাল। আজ সকাল সকাল বের হয়েছে কিছু কেনাকাটা সারার জন্য। তাই ফোনটাও পায় না সে।

বৈকাল নামছে। ফিরছে অণিমা। বগলে নানা সাইজের প্যাকেট নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। সিঁড়ি থেকেই ওর গলা শোনা যায়।

—সীমা! গোছগাছ হল? তোর শাল, দু'খানা শাড়ি, আমার একখানা শাল সব কিনলাম। আর কি কেনা কাটা বাকী আছে দেখতে হবে! কইরে সীমা?

স্তব্ধ বাড়িটায় কোন সাড়া নেই। প্রাণহীন নিস্তব্ধতার মাঝে অণিমার কণ্ঠস্বরটা শোনা যায়। সিঁড়ির মাথায় এসে বাসনা দাঁড়িয়েছে স্তব্ধ হয়ে! জিনিষপত্রগুলো ওর হাতে দিয়ে অণিমা সীমার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। মনে হয় রাগ করেই মেয়ে তার ডাকে সাড়া দেয়নি। দরজার সামনে গিয়ে ডাকছে অণিমা,

—এ্যাই সীমা!

কোন সাড়া নেই। অবাক হয় অণিমা! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাঁক পাড়ে,

—বাসনা!

বাসনা চুপ করে থাকে। চীৎকার করে অণিমা, সব হারানোর বেদনায় আর্ত হয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর।

—কোথায় গেছে সীমা? জবাব দে!

বাসনা বলে—না খেয়ে দুপুরেই বের হয়ে গেছে। কে ফোন করেছিল তারপরই! আপনাকে অপিসে ফোন করলাম পরে—

—তখনই ফোন করিসনি কেন ?

বাসনা চুপকরে থাকে। অণিমা চীৎকার করে,

—কে ফোন করেছিল ? সুব্রত !

চুপ করে থাকে বাসনা। অণিমা হাতের বাকী জিনিষগুলো ছত্রাকার করে ছড়িয়ে দিয়ে ফুঁসছে—ইতর জানোয়ার ! এতবড় স্বার্থপর সে। এভাবে চলে গেল !

নীলেশ কলেজ থেকে ফিরে ওই চীৎকার শুনে উঠে আসে ! অণিমা কি নিদারুণ আঘাতে অবহেলায় অপমানে যেন ফুসেঁ উঠতে চায়, কিন্তু পারে না। একটা অব্যক্ত নির্জনতার দুঃসহ বেদনায় কি আর্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে !

—ছোড়দি ! নীলেশ অবাক হয়।

অণিমা কান্না ভেজা স্বরে বলে—সীমা আমাকে ছেড়ে চলে গেল নীলেশ ? ওভাবে চলে গেল কেন ? মায়ের কথা এতটুকুও ভাবলো না ?

অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পরাজিত বঞ্চিত একটি মেয়ে।

নীলেশ চমকে ওঠে।

আজকের যৌবনকে সে চিনতে পারে নি। মানুষ চিরকালই এক জায়গায় নিষ্ঠুর। সেখানে তার মনের চাওয়ার কাছে কর্তব্য স্নেহ সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

নীলেশ বলে—আমি গিয়ে ওকে বলবো দিদি !

অণিমা চাইল ওর দিকে। চোখের জল তখনও শুকোয় নি। এমনি করে তার অনেক কিছু হারিয়ে গেছে, সংসারের স্বপ্ন, স্বামী, মনের শান্তি, সব কিছু। আজ একমাত্র অবলম্বন বলে যাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল নিজের নিসঙ্গতাকে ভুলে সেই সীমাও।

এ জগতে পাবার সামান্যতম আশা করে ভুলই করেছে সে। নীলেশের কথায় বলে ওঠে অণিমা,

—না ! ওকে আর ডাকিস না নীলেশ। ওখানেই যদি শান্তি পায় সুখে থাকে, থাকুক। ও আর ফিরবে না রে !

হয়তো সত্যিই। অণিমা বলে,

—এ দুনিয়ায় আমি শুধু একা! একাই বাঁচতে হবে রে! কারো কাছে, এ সংসারের কাছে আর আমার পাবার কিছুমাত্র নেই।

কেন তা জানি না! তবে জানি এই প্রশ্নের উত্তর কোন দিন মিলবে না।

....চুপ করে বসে আছে নীলেশ। জীবনের কঠিন নির্মম একটি রূপকে সে প্রত্যক্ষ করেছে অনেক বেদনায়।

...ঢং ঢং ঢং

দূরে কোথায় ঘণ্টা বাজে! দশাশ্বমেধ ঘাটের ওদিকে নির্জন বালুচরে সন্ধ্যা নামছে, গঙ্গার থির নিথর জলের বুকে দু'একটা নৌকা ভেসে যায়। মন্দিরে ঘণ্টা বাজে—শামস্তোত্রধ্বনি ওঠে বাতাসে।

ওই স্তব্ধ শান্ত জগতে কোথায় হারিয়ে গেছে অণিমা!

হঠাৎ মহেশ বেয়ারার ডাকে চমক ভাঙ্গে!

চাইল অণিমা। ঘড়িতে ছ'টা বাজছে! কোথায় অণিমার শূন্য বেদনার্ত নিঃস্ব মন বেনারসের গঙ্গা তীরের স্বপ্ন দেখছিল। অপিস জনহীন হয়ে গেছে।

শীতের সন্ধ্যা! মহেশ বলে,

—বাড়ি যাবেন না দিদি? কেউতো আর নেই অপিসে!

খেয়াল হয় অণিমার—হ্যাঁ!

উঠলো সে। ড্রাইভারও আজ আসেনি।

শীতের কুয়াশা নেমেছে ডালহৌসী অঞ্চলে, লোডশেডিং-এর আলো আঁধারিতে কুয়াশা ঢাকা নির্জন পথ দিয়ে চলেছে ক্লান্ত পদক্ষেপে অণিমা।

আঁধারে তার জুতোর শব্দ ওঠে।

একটি বিন্দুর মত আলো আঁধারি পথে মিলিয়ে যায় নির্জন পথে নিঃসঙ্গ একটি নারী।

আজ ও সব হারিয়ে সে এই শূন্য পৃথিবীতে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে এ যুগের বেদনা বয়ে বয়ে। নিঃসঙ্গ—একাকী!

সমাপ্ত